শুভ মিলন

নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বৃন্দাবন ধর পাবলিশিং হাউস
১৩ কলেজ রো
কলিকাতা-৯

প্রকাশিকা
দীপ্তি ধর
১৩ কলেজ রো
কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ—১৩৪৭

ছবি এঁকেছেন :—
শ্রীগণেশ বসু

মুদ্রক :—
অমরনাথ প্রেস
২০৮ বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

শুভ মিলন

॥ এক ॥

"ভোলো, ওরে ভোলা, ওরে হতভাগা !"

আহ্বানের স্বরে বেশ কঠোরতা থাকিলেও ভোলা বেশ শান্তকণ্ঠেই উত্তর দিল, "কেন গো জ্যেঠাইমা ?"

'এদিকে আয় শীগ্‌গীর্‌ !"

ভোলা হস্তলিপির খাতায় বিভিন্ন ছবি আঁকিয়া হাতটাকে দুরস্ত করিতেছিল। খাতাটা উল্‌টাইয়া রাখিয়া পরিধেয় বস্ত্রের প্রান্তটা কোমরে জড়াইতে জড়াইতে জ্যেঠাইমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং জ্যেঠাইমার এই অসাময়িক আহ্বানে একটু বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিল, "কেন, কি হয়েছে ?"

জ্যেঠাইমা তীব্র দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ক্রুদ্ধ ও বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু—আমার শ্রাদ্ধ ! তুই কি মনে করেছিস্ বল্ দেখি ?"

জ্যেঠাইমার তর্জন-গর্জনে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া মুখ মুচ্‌কাইয়া উপেক্ষার সহিত ভোলা উত্তর করিল, "মনে আবার করব কি ? কিছুই না।"

জ্যেঠাইমা বলিলেন, "কিছুই না তো দিন দিন এমন ধিঙ্গী হয়ে উঠছিস্ কেন ?

ঘাড় নাড়িয়া ভোলা উত্তর দিল, "কিছু মনে করে ধিঙ্গী হচ্ছি নাকি ! তুমি কি বলবে বলো না।"

জ্যেঠাইমা কঠোরস্বরে গর্জন করিয়া বলিলেন, "হতভাগা ছেলে, তুই দুষ্টুমি করে বেড়াবি, আর তার কারণ জানব আমি ?"

জ্যেঠাইমার রাগের বৃদ্ধি দেখিয়া ভোলা যেন একটু ভীত হইল। ঘাড় নীচু করিয়া বলিল, "আমি কি দুষ্টুমি করেছি ?"

জ্যেঠাইমা বলিলেন, তোর ক'টা দুষ্টুমি বলব? দিন-রাত তুই দুষ্টুমি করেই তো বেড়াচ্ছিস্।

ভোলা বলিল, আমি কি পড়াশোনা করি না?

জ্যেঠাইমা বলিলেন, কখন করিস্, তা তুই-ই জানিস্। পড়াশোনায় কি তোব মন আছে? তোর মন আছে শুধু ঝগড়া-বিবাদ আর মারামারিতে।

অভিমানে মুখখানাকে ভারী করিয়া ভোলা বলিল, "তুমি কেবল রাতদিন আমাকে মারামারি কবে বেড়াতেই দেখ!"

জ্যেঠাইমা বলিলেন, "মারামারি তুই করিস্ না?"

ভোলা বলিল,—"কার সঙ্গে মারামারি করেছি, তাই আগে বল!"

জ্যেঠাইমা বলিলেন, "কত লোকের নাম করব? নরেশকে আজ মেরেছিস্ তুই?"

ঘাড় উঁচু করিয়া নির্ভীককণ্ঠে ভোলা উত্তর করিল, "হ্যাঁ মেরেছি।"

রোষ-রুদ্ধস্বরে জ্যেঠাইমা বলিলেন, "কেন মেরেছিস্ তাকে?"

ভোলা এ প্রশ্নের উত্তর দিল না; মাথা নীচু করিয়া নীরবে গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

ভোলাকে ঐভাবে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া জ্যেঠাইমার রাগ আরও বাড়িয়া গেল। তিনি রোষ-কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "আজ ভোলা তোরই একদিন, কি আমারই একদিন। বল্ হতভাগা, কেন মেরেছিস্ নরেশকে?"

ভোলা একটু ইতস্ততঃ করিয়া ভারী গলায় উত্তর দিল, "সে কেন আমাকে বললে?"

—"কি বললে তোকে?"

—"বললে—তুই আমার বাবার ভেতো কুকুর।"

ভোলা অপরাধী হলেও তাহার অপরাধের কারণ অবগত হইয়া জ্যেঠাইমা অনেকটা নরম হইয়া আসিলেন; কোমলকণ্ঠে বলিলেন, "এমন খারাপ কথা নরেশ বললে তোকে!"

মুখ তুলিয়া জোর গলায় ভোলা বলিল, "হ্যাঁ, বলেছে কিনা পট্‌লাকে ডেকে জিজ্ঞাসা কর তুমি!"

জ্যেঠাইমা পট্‌লাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কবিবাব প্রয়োজনীতা দেখিলেন না। তিনি জানিতেন, ভোলা যতই দুষ্ট হউক, মিথ্যাবাদী নয়। তিনি ধীরকণ্ঠে বলিলেন, এমন কথা নরেশ যদি বলে থাকে, তবে সে খুবই অন্যায় করেছে। কিন্তু তাই বলে তাকে মারা—"

তাঁহার কথা শেষ হতেই ঘবেব ভিতব হইতে নরেশের মা আমোদিনী ত্বরিতবেগে বাহিরে আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"তুমিও যেমন পাগল হয়েছ দিদি, নরু ওকে এমন কথা বলেছে! নরু আমার সে ছেলেই নয়, এত কথা সে জানেই না।"

ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রেব মত তাঁহাব দিকে ঘাড বাঁকাইয়া ভোলা রোষ-ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "জানে না ত বললে কি করে?"

ঘাড দোলাইয়া একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া আমোনিনী বলিলেন, "সে কক্ষণো এমন কথা বলেনি বাছা এ তোমাব মতলব মত গডা কথা।"

রাগে দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া ভোলা বলিল, "আমাব গডা কথা! আমি তাব নামে মিছে বলছি?"

আমোদিনী বলিলেন, "মিথ্যেই বল, আব সত্যিই বল, আমি কিন্তু একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বলতে পাবি, নরু কখনও একথা বলেনি।"

স্বরে অস্বাভাবিক জোর দিয়া ভোলা বলিল, "হ্যাঁ বলেছে! পট্‌লা সাক্ষী।"

একটু উপহাসের হাসি হাসিয়া আমোদিনী বলিলেন, পট্‌লা তো তোমারই চেলা। চোরের সাক্ষী গাটকাটা।"

এই উপহাসে ভোলা রাগে অধীর হইয়া বলিল, "পট্‌লা মিথুক, আমি মিথুক, আর তুমিই বুঝি সত্যিবাদি যুধিষ্ঠির!"

ক্ষুদ্র বালকের এতটা স্পর্ধার কথায় আমোদিনী রাগে যেন জ্বলিয়া

উঠিলেন। ক্রোধসমুচ্চকণ্ঠে দিদিকে সাক্ষ্য করিয়া বলিলেন, শুনছো দিদি, একরত্তি ছেলের আস্পদ্দার কথা!"

দিদি ভোলার কথাও শুনিতেছিলেন, আমোদিনীর কথাও শুনিতেছিলেন, এবং শুনিতে শুনিতে তিনি একটা অনর্থক বিবাদের আশঙ্কা করিতেছিলেন। কিন্তু যাহা আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাহাই ঘটিয়া গেল। সুতরাং এক্ষেত্রে তাঁহার কর্তব্য কি স্থির করিয়া লইলেন, এবং ভোলাকে ধমক দিয়া বলিলেন —"চুপ কর ভোলা!"

সদম্ভে ভোলা বলিল, "আমাকে মিথ্যুক বলবে, আর আমি চুপ করে থাকব?"

স্পর্ধিত কণ্ঠে আমোদিনী বলিলেন, 'চুপ করে থাকবি না তো কি করবি তুই?—কি করবি? মারবি আমাকে? মার দেখি, আয় মার্ দেখি!"

আমোদিনী রাগে জ্ঞানশূন্য হইয়া আলুথালু বেশে ভোলার সম্মুখে আগাইয়া আসিলেন। জ্যেঠাইমা তাড়াতাড়ি গিয়া তাঁহার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া শান্তনার স্বরে বলিলেন,—"আহা, করিস্ কি ছোটবৌ, এই একরত্তি ছেলের সঙ্গে ঝগড়া করলে লোকে বলবে কি বল্‌তো!

রাগে হাত-মুখ নাড়িয়া আমোদিনী বলিলেন, আমি একরত্তি ছেলে সঙ্গে ঝগড়া করছি, না ঐ একরত্তি ছেলে কোমর বেঁধে আমাকে মারতে আসছে? ওর কতদূর আস্পদ্দা হয়েছে, তা তুমি দেখতে পাচ্ছো না বুঝি!"

জ্যেঠাইমা বলিলেন, "দেখতে পাচ্ছি সবই। কি কিরব ছোটবৌ, ওর কি জ্ঞানবুদ্ধি আছে? থাকলে তোকে এমন কথা বলে!"

তীব্র শ্লেষের স্বরে আমোদিনী বলিলেন, "ওর জ্ঞানবুদ্ধি নেই, আর জ্ঞানবুদ্ধি আছে বুঝি নরুর, না দেখ দিদি, তোমার এই একচোখো বিচারেই ভোলার আস্পদ্দা এত বেড়ে গিয়েছে। আদর দিয়ে দিয়ে তুমি ওকে একেবারে মাথায় তুলেছ!"

ক্ষুব্ধস্বরে জ্যেঠাইমা বললেন, "আদর—আমি ওকে কি এমন আদর দিচ্ছি ছোটবৌ? মা-বাপ-মরা ছেলে, আমরা ছাড়া ওর দিকে চাইবার কেউ নেই। তবু ওকে দিনরাত দাঁতের কোয়ালে রেখেছি। এর বেশী আর আমাকে কি করতে বলিস্ ছোটবৌ?"

জ্যেঠাইমার চোখ দুইটা সজল—কণ্ঠ অশ্রুভারে গাঢ় হইয়া আসিল। আমোদিনী তাঁহার কথায় যেন অতিমাত্র বিস্ময় অনুভব করিয়া সদুঃখে বলিয়া উঠিলেন,—"ওমা আমি আবার তোমাকে কি করতে বলবো গো! আমি ছেলের মা, আমার কাছে সব ছেলেই সমান। আমি অমন তো৲ার মত আপন-পর মনে করি না দিদি!"

দুঃখ-গম্ভীরকণ্ঠে দিদি বলিলেন, "আমিই বা কাকে আপন, কাকে পর মনে করি ছোটবৌ? ভোলা কি আমার পেটের ছেলে, যে তাকে আমি আপন, আর নরেশকে পর মনে করব? তুই তাই মনে করিস্ বটে, কিন্তু ভগবান জানেন—"

তাঁহার কথায় বাধা দিয়া আমোদিনী ব্যস্ততার সহিত বলিয়া উঠিলেন, "বক্ষা কর দিদি! আর তোমাব ভগবানকে ডাকতে হবে না। ভগবান যদি থাকত, তা'হলে কি ওই একরত্তি ছেলে আমারই খেয়ে আমারই দুধের বাচ্চাটাকে মেরে আধমরা করে?" আসুক আজ ঘরে। আমি গালমন্দ, লাথি-ঝাঁটা সব সইতে পারব, কিন্তু এই দুধের ছেলে, ওর যা হয় একটা উপায় করুক। নইলে আদুরে গোপালের হাতে মার খেয়ে খেয়ে কতদিন বাঁচবে এই বাচ্চা ছেলেটা!"

কথা শেষ কবিয়া আমোদিনী দিদির দিকে একটা বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপপূর্বক দ্রুতপদে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। জ্যেঠাইমা বিষাদ-গম্ভীর মুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ভোলাও কিছুক্ষণ গুম্ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থানের উপক্রম করিল। জ্যেঠাইমা ডাকিলেন,—"ভোলা!"

ভোলা ফিরিয়া দাঁড়াইল। জ্যেঠাইমা বলিলেন, "শত্রু মুখে ছাই

দিয়ে তোর ষোল-সতেরো বছর বয়স হ'ল, কিন্তু জ্ঞানবুদ্ধি কি তোর একটুও হ'ল না ?''

জোরে মাথা নাড়িয়া ভোলা বলিল, "জ্ঞানবুদ্ধি আমার খুব হয়েছে জ্যেঠাইমা, কিন্তু কেউ যে আমাকে যা নয় তাই বলে পার পেয়ে যাবে সেটি হবে না। তাতে আমাকে যে যাই বলুক।''

তিরস্কারের স্বরে জ্যেঠাইমা বলিলেন, "খুব বাহাদুর তুই। কিন্তু তোর বাহাদুরীর জন্যে আমাকে যে পাঁচকথা শুনতে হয়।''

—"না শুনলেই পার।''

''সে উপায় থাকলে আমি কক্ষনো শুনতাম না ভোলা, কিন্তু কি করব, আমি যে নিরুপায়!''

সহাস্যে ভোলা বলিল,—"যখন উপায় নেই, তখন আর কি করবে জ্যেঠাইমা, আমিও দুষ্টমি করব, তোমাকেও পাঁচ কথা শুনতে হবে। যাক্‌গে, এখন আমি আঁকটা ঠিক করি, তুমি ভাত হ'ল কি না দেখ।"

ভোলা সত্বরপদে আপনার পড়িবার স্থানে গিয়া বসিল।

॥ দুই ॥

মামলা-মকদ্দমায় দাঁইহাটির মল্লিদের ঘরের লক্ষ্মী অতিষ্ঠ হইয়া যখন উকিল-মোক্তারের ঘরে চলিয়া গেলেন, তখন মল্লিকদের বড়কর্তা রাজীব মল্লিক নিজেদের মর্যাদা কিরূপে রক্ষা করিবেন তাহাই ভাবিতে ভাবিতে সংসাব ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে মহাজন মল্লিকদের সাতপুরুষের বাড়ীখান নিলামে তুলিতে উদ্যোগী হইল।

রাজীব মল্লিকের দুই ছেলে। ছোট ছেলে বৈদ্যনাথ তখন নাবালক, সুতরাং ভালমন্দ বুঝিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। সে ক্ষমতা জন্মিয়াছিল বড় ছেলে জগন্নাথের। মহাজনের কবল হইতে বাড়ীখানা কি উপায়ে রক্ষা করিবে, জগন্নাথ তাহাই ভাবিয়া আকুল হইয়া

পড়িলেন। কিন্তু বারো হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া মহাজনকে নিরস্ত করিবার কোন উপায় খুঁজিয়া পাইলেন না।

মহাজন নালিশ করিয়া ডিগ্রী জারি করিল। বাড়ীখানা শান্তিপুরের চৌধুরীরা নিলামে ডাকিয়া লইবে, অথবা কালনার নূতন বড়লোক ভজগোবিন্দ সিং খরিদ করিবে, ইহাই লইয়া গ্রামের লোকে আলোচনা করিতে লাগিল। কিন্তু বাড়ীখানাকে মহাজনের গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়া গ্রামের লোকের এই ঔৎসুক্য কিরূপে ব্যর্থ করিয়া দিবে, একটি লোক তাহারই উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। লোকটি মল্লিকদের গোমস্তা গোপীনাথ রায়।

গোপীনাথের বাপ বুড়া বয়স পর্যন্ত এই সংসারে চাকরী করিয়া মারা গেলে রাজীব মল্লিক গোপীনাথকে তাহার পিতার পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। অল্পবয়স্ক হইলেও গোপীনাথ এমনই বিশ্বাসের সহিত কাজ করিয়া আসিতেছিল যে, রাজীব মল্লিক জগন্নাথের চেয়েও গোপীনাথকে বেশী বিশ্বাস করিতেন। এইরূপ বিশ্বাসের সহিত প্রায় বিশ বছর কাজ করিবার পর হঠাৎ যখন মল্লিকদের অবস্থা হীন হইয়া পড়িল, এবং সেই অবস্থার শোচনীয় ফল ভোগ করিবার আশঙ্কায় রাজীবাবু ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন, তখন একমাত্র গোপীনাথই মল্লিকদের সংসারের রক্ষক হইয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু রক্ষক হইলে কি হইবে, রক্ষা করিবার যে কোন উপায়ই নাই। বিষয়-সম্পত্তি সব গিয়াছে, নামডাকও রাজীবাবুর সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইয়াছে; এখন সাতপুরুষের ভিটাখানা পর্যন্ত যে যায়! গোপীনাথ দিন-রাত চুপ করিয়া বসিয়া বাড়ীখানাকে রক্ষা করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

তাহাকে এত ভাবিতে দেখিয়া জগন্নাথ একদিন বলিলেন, "দিনরাত ভেবে ভেবে শেষে তুমি কি মারা যাবে গুপী দা?"

সদুঃখে গোপীনাথ বলিল, "আমি মারা গেলেও যদি তোমাদের বাঁচবার উপায় হ'ত জগ, তা'হলে এক্ষুনি আমি মরতে পারতাম।

কিন্তু মরেও কোন উপায় হবে না, বেঁচে থেকেও হবে না, জগন্নাথ উপায় যখন হবে না, ভগ, তাহলে তখন শুধু শুধু ভেবেই বা কি হবে গুপী দা ?"

ম্লান হাসি হাসিয়া গোপীনাথ বলিল, "যা হবে হোক, আমি আর এ নিয়ে মাথা ঘামাব না।"

গোপীনাথ কিন্তু ভাবনা ছাড়িল না। এদিকে মহাজন নালিশ করিয়া যখন ডিগ্রী জারি করিল, তখন হঠাৎ একদিন গোপীনাথ বাড়ী ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেল।

সাত-আট দিন পরে গোপীনাথ ফিরিয়া আসিয়া জগন্নাথকে বলিল, "চল, মহাজনের কাছে গিয়ে একটা বন্দোবস্ত করে আসি।

গোপীনাথের উদ্দেশ্য কিছু বুঝিতে না পারিলেও জগন্নাথ তাঁহার সঙ্গে মহাজনের নিকট গমন করিলেন।

অনেক বাদানুবাদের পর বারো হাজার টাকার দেনা এগারো হাজারে রফা হইয়া গেল। গোপীনাথ তখন কোমর হইতে নোটের তাড়া বাহির করিয়া এগারো হাজার টাকা গুনিয়া দিল। জগন্নাথের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। গোপীনাথ মহাজনের নিকট হইতে ঋণের ছাড়পত্র লিখাইয়া সহর্ষে জগন্নাথের সঙ্গে বাড়ী ফিরিল।

বাড়ীতে আসিয়া জগন্নাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত টাকা কোথায় পেলে গুপী দা ?"

বিরক্তভাবে গোপীনাথ উত্তর করিল, "টাকা যেখানে ছিল, সেইখান থেকেই পেয়েছি "

জগন্নাথ বলিলেন, "এত টাকা কোথায় ছিল ? দু'শো-চারশো নয়, এগারো হাজার।"

গোপীনাথ এবার হাসিয়া উঠিল ঃ বলিল, "বাপ-বেটায় এতকাল মল্লিকদের সংসারে চাকরী করে যদি এগারো হাজার টাকা জমাতে না পেরে থাকি, তবে মল্লিকদের নামই যে মিথ্যে!"

গোপীনাথ যে বেতন ছাড়া অসদুপায়ে উপরি আয় করিতে পারে, সে বিশ্বাস জগন্নাথের ছিল না। না থাকিলেও এতগুলি টাকা সে

কোথায় পাইল, তাহা জানিবার জন্য আর বেশী পীড়াপীড়ি করা প্রয়োজন মনে করিলেন না।

গোপীনাথ কিন্তু সেইদিনই চাকরীতে ইস্তফা দিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। জগন্নাথ তাহাকে আর কিছুদিন থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলে গোপীনাথ উত্তর করিল, "থেকে আর কি করব জগ? আমাদের মত গরীব লোকের তো বসে থাকলে চলবে না। পেট আছে, স্ত্রীপুত্র আছে, তাদের তো উপায় করতে হবে। এখন চললুম' যদি কখন সময় ফেরাতে পার, খবর দিও।"

গুপীদার এই নিতান্ত পরের মত ব্যবহার দেখিয়া জগন্নাথ বিস্ময়ে যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন, কিন্তু অল্পদিন পরেই তাঁহার এ বিস্ময় দূর হইল। হঠাৎ একদিন তিনি শুনিলেন, কৃষ্ণবাটির ডাকাতির সংস্রবে গোপীনাথ ধরা পড়িয়াছে। সর্বনাশ, তবে কি গুপীদা ডাকাতি করিয়াই টাকার যোগাড় করিয়াছিল! আর এই জন্যই কি গোমস্তার কাজে ইস্তফা দিয়া তাড়াতাড়ি সে এখান হইতে চলিয়া গেল!

জগন্নাথ হাজতে গিয়া গোপীনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া গোপীনাথ যেন ভয়ানক বিরক্ত হইয়া উঠিল। ক্রুদ্ধভাবে বলিল, "তুমি এখানে কেন এলে জগ?"

জগন্নাথ বলিলেন, তোমাকে দেখতে এসেছি গুপী দা!"

ভ্রুকুটি করিয়া গোপীনাথ বলিল, "আমি ডাকাত। ডাকাতের সাথে দেখা করার কি দরকার তোমার? আমায় খালাস করতে এসেছ তুমি? সে সাধ্যি তোমার নেই।"

দৃঢ়স্বরে জগন্নাথ বলিলেন, "নিশ্চয় আছে। তোমাকে খালাস করবার জন্যে আমি আমার সব-কিছু বিক্রী করব।"

গোপীনাথ কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া জগন্নাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর রাগে চোখ দুইটা লাল করিয়া তর্জন সহকারে বলিল, "আমি নিজে জেলে যাব, উকীল-ব্যারিষ্টারের বাবারও সাধ্যি নেই যে আমাকে বাঁচায়। মিছে ছেলেমানুষি ক'রো না। আমার জন্যে

তোমাকে ভাবতে হবে না, তুমি আপনার ঘরে যাও।"

ঈষৎ হাসিয়া জগন্নাথ বলিলেন, "ঘরে ফিরে যাবার জন্যে আমি আসিনি গুপী দা! তুমি যদি আমার কথা না শোন, তা'হলে আমি হাকিমের কাছে গিয়ে বলব, এই ডাকাতির সঙ্গে আমারও যোগ আছে। ডাকাতির টাকা নিয়ে আমি দেনা শোধ করেছি।"

গোপীনাথ এবার যেন একটু দমিয়া গেল। কিছুক্ষণ ভাবিয়া অপেক্ষাকৃত ও শান্তস্বরে বলিল, "তুমি কি পাগল হয়েছ জগ?"

জগন্নাথ বলিলেন, "পাগল হইনি গুপীদা, পাগলামি করছ তুমি।"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া কাতরকণ্ঠে গোপীনাথ বলিল, "পাগলামি নয় জগ, জেনেশুনে যে পাপ করেছি, জেলে গিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করব। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তে বাধা দিও না ভাই!"

গোপীনাথের স্বরেব ভিতর দিয়া যেন অন্তর্দাহের গভীর যাতনা ফুটিয়া উঠিল। দুঃখভবা গাঢ়কণ্ঠে জগন্নাথ বলিলেন, "জেনেশুনে কেন এমন পাপ করলে গুপীদা?'

জগন্নাথেব মুখেব উপর সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গোপীনাথ বলিল, "কেন করেছি, তুমি তার কি বুঝবে জগ? ডাকাতি তো তুচ্ছ, তখন যদি দরকার হ'ত, মানুষ খুন করেও টাকা যোগাড় করতাম।"

তারপর হঠাৎ উঠিয়া হাত বাড়াইয়া জগন্নাথের হাত ধরিল, কাতরকণ্ঠে মিনতি করিয়া বলিল, "আমাকে যদি একটুও ভালবেসে থাক জগ, আমার কাছ থেকে উপকার পেয়েছ মনে কর, তা'হলে আমার এই অনুরোধটি রক্ষা কর,—আমাকে বাঁচাবার জন্যে চেষ্টা ক'রো না।"

জগন্নাথের চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িল। গোপীনাথ তাঁহার হাত ছাড়িয়া দিয়া অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িল।

চোখের জল মুছিয়া জগন্নাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার স্ত্রীপুত্রের কি হবে?"

গোপীনাথ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বেদনারুদ্ধকণ্ঠে বলিল,

"ভগবান যা করবেন তাই হবে। তাদের জন্যে আমার কোন ভাবনা নেই।"

জগন্নাথ রুমালে চোখ মুছিতে মুছিতে হাজতের বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

।। তিন ।।

যথাসময়ে দায়রার বিচারে অন্যান্য আসামীদের সহিত গোপীনাথের পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইল। সেই সংবাদ শুনিয়া জগন্নাথ বালকের মত মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। দেখিয়া স্ত্রী মহামায়া বলিলেন,—"দেখ, কেঁদে কিছু হবে না। তার চাইতে আমার গয়নাগাটি সব বেচে হাইকোর্টে আপীল কর।"

কাঁদিতে কাঁদিতে জগন্নাথ বলিলেন, "যে নিজমুখে দোষ স্বীকার করে জেলে গিয়েছে, হাইকোর্ট তার কিছুই করতে পারবে না বড়বৌ! সে পথ থাকলে আমি বাড়ীঘর সব বিক্রী করে উকীল-ব্যারিষ্টার দিতাম।"

মহামায়া বলিলেন, "তবে আর তার জন্যে কেঁদে কি করবে? এখন যাতে তার স্ত্রীপুত্র এক মুঠো ভাতের কষ্ট না পায়, তার উপায় কর।"

জগন্নাথ গোপীনাথের স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া গুপী দা'র নিকট কৃতজ্ঞতা-ঋণ হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভের জন্য চেষ্টিত হইলেন।

বছর দুই পরে বৈদ্যনাথ এফ, এ, পরীক্ষা দিয়া চাকরীতে প্রবিষ্ট হইল। সুপারিশের জোরে মাহিনাও মোটা হইল। যে অল্প পরিমাণ ভূসম্পত্তি ছিল, জগন্নাথ নিজের তত্ত্বাবধানে চাষ-আবাদ করিয়া বেশ লাভবান হইতে লাগিলেন। তাঁহার বুদ্ধিচাতুর্যে সম্পত্তিও কিছু কিছু

বাড়িতে লাগিল দেখিয়া লোকে বলাবলি করিতে লাগিল,—মল্লিকদের পড়তা আবার বুঝি ফিরিল।

অবস্থা যখন বেশ সচ্ছল হইয়া আসিল, তখন মহামায়া স্বামীকে বলিলেন,—"এবার ঠাকুরপোর বিয়ে দাও।"

জগন্নাথ বলিলেন, "গুপীদা ফিরে না এলেকে ওর বিয়ের চেষ্টা করবে ?"

মহামায়া বলিলেন, "তার তো ফিরতে এখনো তিন বছর দেরী।"

ঘাড় নাড়িয়া জগন্নাথ বলিলেন, "না, দু' বছর সাত মাস উনিশ দিন।"

সহাস্যে মহামায়া বলিলেন, "তুমি দিন গুনে রাখো নাকি ?"

জগন্নাথ বলিলেন, "গুপীদা জেলে কষ্ট পাচ্ছে, কিন্তু আমি ঘরে বসে যে জেলখানার কষ্ট ভোগ করছি বড়বৌ।"

স্বামীর মর্মবেদনায় গুরুত্ব অনুভব করিয়া মহামায়া আর বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে পারিলেন না।

বাডীখানা পুরাতন, সুতরাং স্থানে স্থানে সংস্কারের আবশ্যক হইয়া পডিয়াছিল। বৈদ্যনাথ একবাব ছুটীতে বাডী আসিয়া বাডীর অবস্থা দেখিয়া বলিল, "বাডীখানা মেরামত করলে হয় না দাদা ?"

জগন্নাথ উত্তর করিলেন, "যার বাড়ী সে আগে ফিরে আসুক।"

—"ততদিনে যদি ভেঙ্গে পড়ে ?"

—"ভাঙ্গা বাড়ী গড়বার ক্ষমতা তার আছে।"

গোপীনাথের জন্য জ্যেষ্ঠের এতটা ব্যাকুল প্রতীক্ষায় বৈদ্যনাথ হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কাজেই তাহাকে বাটির সংস্কারের প্রস্তাব পরিত্যাগ করিতে হইল।

জগন্নাথের আশা কিন্তু পূর্ণ হইল না। জেলখানা হইতে গোপীনাথ আর ফিরিয়া আসিল না। তাহার ফিরিবার ঠিক এক বৎসর আগে জগন্নাথ হঠাৎ জেল-কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে এক টেলিগ্রাম পাইলেন,—"গোপীনাথের আসন্ন অবস্থা উপস্থিত। মৃত্যুর পূর্বের সে জগন্নাথের

সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষী হইয়াছে।

টেলিগ্রাম পাইয়াই জগন্নাথ বহরমপুরের জেলে গিয়া গোপীনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। গোপীনাথ তখন রক্তামশায় বোগে আক্রান্ত হইয়া জেল-হাসপাতালে ছিল, এবং হাসপাতালেব নিয়মানুযায়ি উপযুক্ত চিকিৎসা সত্বেও সে বুঝিতে পারিয়াছিল, মৃত্যু ক্রমেই তাহার সন্নিহিত হইয়া আসিতেছে। জগন্নাথকে দেখিয়া গোপীনাথ কাঁদিতে লাগিল। জগন্নাথও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আমি যে তোমার মুক্তির দিন গুনে রাখছিলাম গুপী দা!"

গোপীনাথ বলিল, "আর তোমাকে দিন গুনতে হবে না জগ, আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। স্ত্রী রইলো, ভোলা রইলো, আব তুমি রইলে!"

জগন্নাথ বলিলেন, "তোমার স্ত্রী আমার মা, ভোলা আমার ছেলে। তাদের কি একবার দেখতে চাও গুপী দা?"

গোপীনাথ বলিল, "না। শুধু তোমার সঙ্গে একবার দেখা করবার সাধ ছিল।"

পরদিন হাসপাতালের মধ্যেই গোপীনাথ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সংসারের জেলখানা হইতে মুক্তিলাভ করিল। জগন্নাথ তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে ফিরিলেন।

গোপীনাথ স্ত্রী-পুত্রের ভার জগন্নাথের উপর দিয়া গিয়াছিলেন। স্ত্রীর ভার জগন্নাথকে লইতে হইল না। গোপীনাথের মৃত্যুর কয়েক মাস পরেই স্ত্রী স্বামীর অনুগমন করিল।

জগন্নাথ ভোলাকে স্বগৃহে লইয়া আসিলেন। তাহাকে মহামায়ার হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, "তোমার ছেলে হয়নি বলে বড় দুঃখ ছিল বড়বৌ! এই নাও, একেবারে আট বছরের ছেলে এনে দিলাম।"

মহামায়া সাদরে ভোলাকে কোলে তুলিয়া লইলেন।

॥ চার ॥

শোক-দুঃখটা সংসারে সব সময়ই বড় থাকে ; যত গুরুতরই হউক, সামান্য সুখের অবতরণেও তাহা চাপা পড়ে। জগন্নাথের তাহাই হইল। মনের ভিতর ক্ষত থাকিলেও তাহার উপর সান্ত্বনার প্রলেপ পড়িল। জগন্নাথ ভাঙ্গা বাড়ী মেরামত করিয়া, বৈদ্যনাথের বিবাহ দিয়া সংসারের কর্ম-কোলাহলের মধ্যে গুপীদার শোচনীয় স্মৃতি ডুবাইয়া দিলেন। আর ভোলানাথ মাতৃহীনতার বেদনা বিস্মৃত হইয়া মহামায়ার স্নেহনীড়ের মধ্যে প্রতিপালিত হইতে লাগিল।

মহামায়া নিঃসন্তান। ছোটবৌ আমোদিনীরও তখন ছেলেপিলে হয় নাই। সুতরাং বাড়ীতে ছেলেমেয়ে না থাকায় ভোলা সকলেরই আদর-যত্নের পাত্র হইয়া উঠিল। জগন্নাথ তাহার পড়াশোনার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

অতিরিক্ত আদর পাইয়া ভোলা যেন একটু আব্দারে হইয়া উঠিল। ইহা যে পরের ঘর, এই বাড়ীর কেহই যে তাহার আপন নহে, অল্পদিনের মধ্যেই ভোলার এ জ্ঞান তিরোহিত হইল। সে সকলকেই নিতান্ত আপন ভাবিয়া সকলের নিকট হইতেই আপনার আব্দার পূর্ণ করিয়া লইতে চাহিত। অপর সকলে স্নেহে তাহার আব্দার পূর্ণ করিয়া দিলেও আমোদিনীর কিন্তু পরের ছেলের এতটা বাড়াবাড়ি ভাল লাগিত না।

ভোলার উপর আমোদিনীর বিদ্বেষের কারণ ছিল। তিনি পিত্রালয় হইতে কৃষ্ণনগরের কতকগুলি ভাল ভাল পুতুল লইয়া আসিয়াছিলেন এবং সেই পুতুলগুলিকে নিজের ঘরে সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। সেই সুন্দর পুতুলগুলি দেখিয়া ভোলার একদিন একটি পুতুল লইবার ইচ্ছা হইল। আমোদিনী কিন্তু তেমনি দামী পুতুল ছেলেমানুষের হাতে দিয়া

নষ্ট করিতে রাজী হইলেন না! একটি পুতুল লইবার জন্য সে ভয়ানক বায়না ধরিল। মহামায়া তাহার প্রার্থিত পুতুটি দিয়া তাহাকে শান্ত করিবার জন্য আমোদিনীকে অনুরোধ করিলেন। আমোদিনী তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলেন না, বরং ভোলাকে এত বেশী আদুরে করিয়া মহামায়া যে কতদূব গর্হিত কাজ করিরাছেন, সে সম্বন্ধে তাঁহাকে এমন কতকগুলি উপদেশ দিলেন; যাহা মহামায়ার নিকট তীব্র তিরস্কার বলিয়াই মনে হইল। জগন্নাথ তখন বৈদ্যনাথকে চিঠি লিখিয়া কলিকাতা হইতে পুতুল আনাইয়া দিয়া ভোলাকে শান্ত করিলেন এবং আমোদিনীর এইরূপ রূঢ় ব্যবহারের জন্য উপদেশচ্ছলে তাঁহাকে দুই চারি কথা শুনাইয়া দিলেন।

ইহার পর বৈদ্যনাথ বাড়ীতে আসিয়া নিজের ঘরে এত ভাল ভাল পুতুল দেখিয়া মহামায়াকে যখন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ঘরে এত সুন্দর সুন্দর পুতুল থাকিতেও কি জন্য কলিকাতা হইতে পুতুল আনিতে লেখা হইল, তখন অনিচ্ছাসত্বেও মহামায়াকে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে হইল। বৈদ্যনাথ তাহা শুনিয়া স্ত্রীকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন।

এইরূপে সকলের নিকট তিরস্কৃত হওয়ায় আমোদিনীর ভয়ানক রাগ হইল, এবং সেই রাগটা তাঁহার তিরস্কারের মূল কারণ ভোলার উপর গিয়া পড়িল। সেইদিন হইতে আমোদিনী ভোলাকে আরও অধিক বিদ্বেষের দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন।

ইহার পরে আমোদিনী সন্তানের জননী হইয়াও ভোলার উপর এই বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না।

প্রকৃতির কেমন একটা নিয়ম, মনে মনে কাহাকেও ভালবাসিলে বা ঘৃণা করিলে তাহার নিকট হইতেও ঠিক ভালবাসা বা ঘৃণাই পাওয়া যায়। ইহাকেই বলে প্রকৃতির প্রতিশোধ। আমোদিনীও প্রকৃতির এই প্রতিশোধ হইতে অব্যাহতি পাইলেন না। তাঁহার আন্তরিক

বিদ্বেষের ফলে ভোলাও ঠিক তাঁহার উপরে বিদ্বেষভাব পোষণ করিতে লাগিল।

ভোলা কিন্তু মহামায়ার স্নেহনীড়ের মধ্যে এমনই ভাবে লুকাইয়া ছিল যে, আমোদিনীর বিদ্বেষের উত্তাপ একটুও তাহার গায়ে লাগিত না। কচিৎ কখন একটু লাগিলেও ভোলা তাহা আদৌ গ্রাহ্য করিত না!

ভোলাকে এইরূপে পুত্রবৎ প্রতিপালিত হইতে দেখিয়া, তাহাকে পোষ্যপুত্র করিয়া লইবার জন্য অনেকে জগন্নাথকে উপদেশ দিল। জগন্নাথ তাহা মানিলেন না। পোষ্যপুত্রের তাঁহার কি প্রয়োজন? নরেশ বাঁচিয়া থাকুক, পিতৃপুরুষের জলপিণ্ড তো লোপ পাইবেন না। তবে ভোলার একটু ব্যবস্থা করা দরকার। তা লেখাপড়া শিখিয়া ভোলা আগে মানুষ হউক। তারপর তাহার বিবাহ দিয়া তাহার সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিয়া দিলেই হইবে। সে কাজে এত তাড়াতাড়ির প্রয়োজন কি?

কিন্তু তাড়াতাড়ির যে প্রয়োজন ছিল, তাহা জগন্নাথ সেই দিনই বুঝিতে পারিলেন, যেদিন সামান্য রোগশয্যা তাঁহার মৃত্যুশয্যায় পরিণত হইল। মৃত্যুর পূর্বে জগন্নাথ ভোলাকে মহামায়া ও বৈদ্যনাথের হস্তে সমর্পণ করিয়া গেলেন।

জগন্নাথের মৃত্যুর পর হইতে বৈদ্যনাথ ভোলার দিকে একটু বেশী লক্ষ্য রাখিলেন।

ট্রেনে প্রত্যহ যাতায়াতের সুবিধা থাকিলেও বৈদ্যনাথ আগে কলিকাতায় বাসা ভাড়া করিয়া থাকিয়া চাকরী করিতেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠের মৃত্যুর পরে তাঁহার আর কলিকাতায় থাকা চলিল না। অথচ দেড়শত টাকা মাহিনার চাকুরীর মায়াও ত্যাগ করা যায় না। কাজেই তাঁহাকে অতঃপর ডেলি প্যাসেঞ্জার হইয়া প্রত্যহ অফিসে যাতায়াত করিতে হইল।

॥ পাঁচ ॥

আমোদিনীর অন্তর্নিহিত বিদ্বেষ শুধু তাঁহার অন্তরের মধ্যেই আবদ্ধ রহিল না। সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় তাহা বালক নরেশের হৃদয়েও ক্রমশঃ প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল এবং তাহার শিশু-হৃদয়কে ধীরে ধীরে বিষাক্ত করিয়া তুলিল। মাতার আদর্শেও শিক্ষায় নরেশ ভোলাকে বিদ্বেষের দৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করিল।

ভোলা নরেশকে যথার্থ ই ভালবাসিত এবং সেই ভালবাসার প্রভাবে নরেশের সরল শিশু-হৃদয়ও ভুলোদার দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের এই ভালবাসা আমোদিনীর কিন্তু ভাল লাগিত না। তিনি ছেলে দুইটির এই অকপট ভালবাসার মধ্যে বিদ্বেষের প্রাচীর টানিয়া দিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার এরূপ চেষ্টার কারণও একটু ছিল। তিনি নিজের মনে মনেই তর্কবিতর্ক করিয়া স্থির করিয়া লইয়াছিলেন ভোলার উপর মহামায়ার যেরূপ স্নেহ এবং নিজের স্বামীর যেরূপ ভালবাসা, তাহাতে তাঁহারা ভবিষ্যতে ভোলাকে অন্ততঃ সম্পত্তির অর্ধাংশের উত্তরাধিকারী করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। ইহার উপর যদি তাঁহার সন্তান-সন্ততি না থাকে, তাহা হইলে হয়তো ভোলাকে তাঁহারা সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী করিয়া দিবেন। ভোলাও যেভাবে চলিতেছে, তাহাতে তাহার নিজের মনেও এই ধারণাটা বদ্ধমূল হওয়া অসম্ভব নহে। এ অবস্থায় ভোলার সঙ্গে নরেশকে বেশী মেলামেশা করিতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। কি জানি, সমস্ত সম্পত্তির লোভে ভোলা যদি নরেশের অনিষ্টের চেষ্টা করে।

মনের ভিতর এইরূপ কুৎসিত চিন্তা লইয়া আমোদিনী সশঙ্কচিত্তে নরেশকে ভোলার নিকট হইতে দূরে সরাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

নরেশ কিন্তু ভোলার সঙ্গে এমনই মিলিয়া গিয়াছিল যে, তাহাকে টানিয়া দূরে লইয়া আসা সহজ হইল না। ভোলার সঙ্গে না খাইলে নরেশের খাইয়া তৃপ্তি হয় না, স্বতন্ত্রভাবে খাইতে দিলে সে তাহা স্পর্শও করে না। ভোলা বেড়াইতে গেলে নরেশ তাহার পিছু পিছু ছুটিয়া যায়, বাধা দিতে গেলে কাঁদিয়াকাটিয়া অনর্থ বাধাইয়া দেয়। সন্ধ্যার পর ভোলা পড়িতে বসে, নরেশ তাহার সঙ্গে আবোল-তাবোল বকিয়া যায় এবং বকিতে বকিতে শ্রান্ত হইয়া তাহার হাঁটুতে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। ঘরে ঘুম পাড়াইতে গেলে কাঁদাকাটা করিয়া আমোদিনীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। আমোদিনী ভাবেন, সর্ব্বনাশ! ভোলা ছেলেটাকে যাদু করিল নাকি!

ভোলার উপর নরেশের এই অত্যধিক আসক্তিকে আমোদিনী ভোলার উপর অত্যার বলিয়া ঘোষণা করিয়া ভোলাকে এই অত্যাচার হইতে মুক্ত করিবার জন্য নরেশকে আগলাইবার চেষ্টা করিতেন। আহা ভোলা তাড়াতাড়ি একমুঠো খাইয়া ইস্কুলে যাইবে আর নরেশ ছেলেটা কিনা তাহার সঙ্গে খাইতে বসিয়া তাহার খাওয়া ও সময় দুই-ই নষ্ট করিয়া দেয়! বেচারা কোথায় একটু বেড়াইতে যাইবে, ছেলে কিনা তাহার কাঁধে চাপিয়া বসিল। সে পড়িতে বসিবে, আর ও' গিয়া তাহার পড়ার ক্ষতি করিবে। ভোলা তাহার এই সকল অত্যাচার সহ্য করিলেও আমোদিনীর যেন সহ্য হয় না—হইলই বা নিজের ছেলে!

নরেশ কিন্তু মাতার আদেশ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া ভোলার উপর অত্যাচার করিতে থাকিত, আর ভোলাও তাহার সকল অত্যাচার সহাস্যমুখেই সহ্য করিয়া যাইত। বরং কোনদিন অত্যাচারের ত্রুটি দেখিলে তাহা সম্পূর্ণ করাইয়া লইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িত।

সেদিন ভোলা খাইতে বসিয়া নরেশকে দেখিতে না পাইয়া মহামায়াকে জিজ্ঞাসা করিল, "নরু কোথায় গেল জ্যেঠাইমা?"

জ্যেঠাইমা বলিলেন, "সে তার মায়ের সঙ্গে স্নান করতে গেছে।"

মুখ ভ্যাংচাইয়া ভোলা বলিল, "এমন সময় স্নানে যায় নাকি কেউ।"

মহামায়া ছোটবৌয়ের মনোভাব যেন কতকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি ভোলাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "এমন সময় স্নানে গেছে তাতে হয়েছে কি? ও সঙ্গে না খেলে তোর খেয়ে পেট ভরে না?"

ভোলা বলিল, "আমার পেট ভরে জ্যেঠাইমা, কিন্তু আলাদা খেলে তার খাওয়া হয় না।"

মহামায়া ধমক দিয়া বলিলেন, "তোকে বলেছে খাওয়া হয় না? হোক না হোক তোর স্কুলের বেলা হচ্ছে, তুই খাবি কি না?"

জ্যেঠাইমার রাগ দেখিয়া অনিচ্ছা সত্বেও ভোলাকে আহারে সম্মতি দিতে হইল। মহামায়া ভাত আনিয়া দিলে সে নিতান্ত বিষণ্ণভাবে আহার করিতে বসিল।

প্রায় অর্ধেক খাওয়া হইয়াছে, এমন সময় নরেশ মায়ের সঙ্গে বাড়ীতে আসিল, এবং ভুলোদাকে খাইতে দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহার সঙ্গে খাইতে বসিল। এতক্ষণে ভোলার বিষাদ-গম্ভীর মুখে হাসি ফুটিল, এবং নরেশকে লইয়া হাসিতে হাসিতেই সে আহার শেষ করিল।

একদিন কিন্তু নরেশের জন্য ভোলার এই ব্যগ্রতা তাহার নিদারুণ মর্মবেদনার কারণ হইয়া দাঁড়াইল। সেদিন সে নরেশকে লইয়া বেড়াইতে গিয়াছিল। খালের ধারে একটা কুলগাছে বিস্তর কুল পাকিয়াছিল। ভোলা গাছে উঠিয়া নরেশের কোঁচড়ে কতকগুলি কুল জড়ো করিল, তারপর গাছ হইতে নামিলে নরেশও তাহার সঙ্গে কয়েকটা খাইল। শেষে দুইজনে বাড়ী ফিরিয়া নিয়মমত আহার করিয়া শুইয়া পড়িল।

খানিক রাত্রিতে হঠাৎ নরেশের ভেদবমি আরম্ভ হইল। বৈদ্যনাথ ডাক্তার ডাকিতে গেলেন, আমোদিনী কাঁদিয়া পাড়া মাথায় করিলেন। বমির সঙ্গে কুলের খোসা কয়েকটা বাহির হইয়াছিল। মহামায়াকে সেইগুলি দেখাইয়া আমোদিনী চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন,

"ওগো আমার বাছাকে কে বিষফল খাইয়েছে গো, বাছা আমার আর বাঁচবে না গো!"

মহামায়া তাঁহাকে যতই সান্তনা দিতে লাগিলেন, আমোদিনী ক্রন্দনের স্বর ততই বাড়িতে লাগিল।

বাস্তবিক যে নরেশ কুল ছাড়া আর কিছুই খায় নাই, এবং কুলের অম্লরসের প্রভাবেই যে তাহার এইরূপ ভেদবমি হইতেছে, ডাক্তার আসিয়া যখন এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, তখন তাঁহার মন্তব্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া মহামায়া বা বৈদ্যনাথ শান্ত হইলেও আমোদিনী কিন্তু শান্ত হইলেন না। মহামায়া ও বৈদ্যনাথের অনুরোধেই যে ডাক্তার ভোলার কীর্তি গোপন করিয়া এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন, ইহাই ধারণা করিয়া লইয়া তিনি প্রথমতঃ ভোলার, পরে নিজের অদৃষ্টের উপরে দোষারোপ করিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

ভোলার ভাগ্যবশঃতই হউক বা রোগ তেমন কঠিন নহে বলিয়াই হউক, কয়েক দাগ মাত্র ঔষধ খাইয়াই নরেশ আরোগ্য লাভ করিল। ভোলা কিন্তু ইহার পর হইতে আর নরেশকে বেড়াইতে লইয়া যাইত না। নরেশ যাইতে চাহিলে আমোদিনী তাহাকে ধরিয়া রাখিতেন। শুধু যে তাহার বেড়াইতে যাওয়া বন্ধ হইল তাহা নহে, আমোদিনী ক্রমে ভোলার সহিত আহারে পর্যন্ত বাধা দিতে লাগিলেন। ভোলার আহারের সময় হইলে আমোদিনী এমনই কৌশলে ছেলেকে সরাইয়া লইয়া যাইতেন যে, নরেশ ভুলোদার সঙ্গে একত্র খাইবার সুযোগ পাইত না।

একদিন নরেশ সে সুযোগ পাইল। ভোলার আহারের সময় হইয়াছে বুঝিয়া আমোদিনী নরেশকে লইয়া পাশের বাড়ীতে বেড়াইতে গেলেন। সেখানে গিয়া তিনি সে-বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে গল্পে নিমগ্ন হইলেন। নরেশ হঠাৎ মায়ের অজ্ঞাতসারে বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দেখিল ভুলোদা খাইতে বসিয়াছে। সে ছুটিয়া ভোলানাথের কাছে

গিয়া সাগ্রহে বলিল, "আমি খাব ভুলোদা!"

নরেশকে তাহার সঙ্গে খাইতে দিতে আমোদিনীর যে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা, ইহা ভোলা জানিয়া ফেলিয়াছিল; তবু নরেশ কাছে আসিয়া যখন বসিল, তখন ভোলা তাহাকে নিষেধ করিতে পারিল না; হাত ধরিয়া তাহাকে পাতের কাছে বসাইল। মহামায়া তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "না-না, ওর খেয়ে কাজ নেই; ওর মা আবার রাগ করবে।"

ঈষৎ হাসিয়া ভোলা বলিল, "তা করুক, আমার সঙ্গে খেয়ে ওর জাত যাবে না তো?

মহামায়া বলিলেন, "জাত যাবে না, কিন্তু মায়ের হাতে মার খেয়ে ওর গতর যাবে।"

নরেশ কিন্তু অনেক দিন পরে ভুলোদার সঙ্গে খাইবার সুযোগ পাইয়া মাতার প্রহারের ভয় মনে আনিল না; সে ব্যগ্রতার সহিত আহারে প্রবৃত্ত হইল। ভোলা বলিল, "আর দু'খানা মাছ দাও জ্যেঠাইমা, অনেক দিন পরে নরু আমার সঙ্গে খেতে বসেছে।"

এদিকে নরেশকে দেখিতে না পাইয়া আমোদিনীর যেন চমক লাগিল। তিনি সশঙ্কচিত্তে দ্রুতপদে বাটীতে উপস্থিত হইলেন, এবং আসিয়া নরেশকে ভোলার সঙ্গে আহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া ক্রোধে ক্ষোভে অধীর হইয়া পড়িলেন। তিনি হতভাগা ছেলের পিঠে চাপড় মারিয়া তাহাকে পাতের কাছ হইতে টানিয়া লইলেন। প্রহারের জন্য যতটা না হউক, পাতের কাছ হইতে লওয়ায় নরেশ চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, এবং মাতার হাত ছাড়াইয়া খাইতে যাইবার জন্য টানাটানি করিতে লাগিল। মহামায়া বলিলেন, "আহা মুখের গ্রাস থেকে টেনে নিয়ে যাস্‌নি ছোটবৌ, আজকার মত না হয় ছেড়ে দে!"

বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া তীব্রকণ্ঠে আমোদিনী বলিলেন, "কখ্‌খনো ছাড়ব না। হতভাগা ছেলে—পরের সঙ্গে না খেলে পেট ভরে না! আজ মারের চোটে ওর খাওয়া ঘুচিয়ে দেব।"

আমোদিনী ছেলেকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন। নরেশ একবার জ্যেঠাইমাকে একবার ভুলোদাকে ডাকিয়া আর্তস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। তাহার চিৎকারে ফল কিন্তু কিছুই হইল না; আমোদিনীর রুদ্রমূর্তি দেখিয়া ভোলা বা মহামায়া আর কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না। আমোদিনী রোরুদ্যমান বালকের পৃষ্ঠে আরও কয়েক ঘা বসাইয়া দিয়া তাহাকে ঘরে পুরিয়া দরজায় শিকল তুলিয়া দিলেন। নরেশের আর্ত চীৎকারে ঘরখানা যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। ভোলা হাতের ভাত পাতে ফেলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া গেল।

এইরূপে আমোদিনী ধীরে ধীরে নরেশকে ভোলার নিকট হইতে দূরে সরাইয়া দিতে লাগিলেন। তিনি নরেশকে নিয়ত বুঝাইতে লাগিলেন, ভোলা শুধু পর নয়—শত্রু। তাহার একমুঠো ভাতের আধ মুঠো ভাগ লইবার জন্য উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে। সুযোগ পাইলেই সে কোন না কোন দিন সর্বনাশ করিয়া বসিবে। সুতরাং এই শত্রুর সঙ্গে মেলামেশা করা সম্পূর্ণ অনুচিত।

জ্ঞান-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মাতার উপদেশগুলি নরেশের হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া যাইতে লাগিল, এবং তাহার সরল শিশু-হৃদয় একটু একটু করিয়া বিদ্বেষে ভরিয়া উঠিল। আগে যে ভোলার সঙ্গ-লাভের জন্য নরেশের হৃদয় ব্যাকুল হইয়া থাকিত, এখন সেই ভোলাকে দেখিলে নরেশ মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া যায়। এখন ভোলার একটি কথাও আর নরেশের সহ্য হয় না। তাহার কথার উত্তরে সেই আট বছরের ছেলে এমন কড়া কড়া কথা বলে, যাহা শুনিলে ভোলার আপাদমস্তক রাগে জ্বলিয়া উঠে। দেখিয়া শুনিয়া ভোলাও ক্রমশঃ নরেশের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল।

সেদিন ভোলা ও নরেশ স্কুল হইতে ফিরিতেছিল। নরেশ ছিল আগে, ভোলা পেছনে। নরেশ আসিতে আসিতে এক সমবয়স্ক বালকের সঙ্গে বিবাদ করিয়া তাহার খাতা ছিঁড়িয়া দিয়াছিল। ভোলা

সেখানে উপস্থিত হইলে বালকটি কাঁদিতে কাঁদিতে ভোলার নিকট নালিশ করিল। ভোলা নরেশের অন্যায় দেখিয়া তাহার কান মলিয়া দিল। ইহাতে নরেশ উত্তেজিত হইয়া রাগে চোখ-মুখ ঘুরাইয়া ভোলাকে বলিল, "তুই আমার কান মলবার কে? তুই তো আমার বাবার ভেতো কুকুর!"

ছেলেগুলির সামনে নরেশের মুখে এত বড় স্পর্ধার কথা শুনিয়া ভোলা লজ্জায় ক্ষোভে যেন ম্রিয়মাণ হইল। দেখিল, পট্‌লা প্রমুখ কয়েকটা ছেলে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মিটিমিটি হাসিতেছে।

ভোলা আর রাগ সামলাইতে পারিল না; সে রাগে নরেশকে উত্তম-মধ্যম দিয়া তাহার স্পর্ধার প্রতিশোধ লইল। নরেশ কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী ফিরিয়া মাতাকে প্রহারের চিহ্ন দেখাইল। আমোদিনী রাগে দুঃখে অধীর হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মহামায়ার নিকট ছুটিয়া গিয়া তাঁহার আদুরে গোপালের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন।

মহামায়া কিন্তু এক পক্ষের অভিযোগ শুনিয়া ভোলার শাস্তির ব্যবস্থা করিলেন না, বাদী-প্রতিবাদী উভয়ের বক্তব্য শুনিয়া সুবিচার করিতে গেলেন। আমোদিনী এ বিচারে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। মহামায়ার নিকট ন্যায় বিচারের আশা নাই দেখিয়া তিনি স্বীয় অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

॥ ছয় ॥

বৈদ্যনাথ অফিস হইতে ফিরিয়াই স্ত্রীর অভিযোগ শুনিলেন এবং একটু রাগে রাগেই মহামায়ার নিকট গিয়া বলিলেন, "ভোলা নাকি আজ মারের চোটে নরেশকে আধমরা করেছে বৌঠান?"

মহামায়া বলিলেন, "আধমরা না করুক, তবে দু'-এক ঘা মেরেছে বটে।"

"দু'-এক ঘা-ই বা মারল কেন?"

"নরেশ তাকে নাকি অপমানের কথা বলেছিল।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বৈদ্যনাথ বলিলেন, "ওঃ, ভারি তো মানী লোকটা তার আবার অপমান! না বৌঠান, অতিরিক্ত আদর দিয়ে ওকে তুমি বড্ড বাড়িয়ে তুলেছ।"

ক্ষোভে মহামায়ার ওষ্ঠাধর স্ফুরিত হইয়া উঠিল; বলিলেন, "আমাকে কি এমন আদর দিতে দেখলে বল তো? একমুঠো ফেনা ভাতে মানুষ হচ্ছে, দিনরাত বকুনি খাচ্ছে, তাতেও যদি তোমরা আদর দেখতে পাও, তা হলে কি ওকে গলা টিপে মেরে ফেলতে বল?

যেন একটু অপ্রতিভভাবে মাথা নাড়িয়া বৈদ্যনাথ বলিলেন, "মেরে ফেলতে বলব কেন বৌঠান? তুমি রাগ করছো কেন, একটু বুঝে দেখ দেখি—"

গম্ভীরকণ্ঠে মহামায়া বলিয়া উঠিলেন, "আমার বুঝে দেখবার কিছুই নেই ঠাকুরপো! আজ যদি তোমার দাদা বেঁচে থাকত, বুঝে দেখত সে। ওর বাপের জেল হয়েছে শুনে সে উঠোনের ওইখানটায় লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল—এ জেল গুপীদা'র নয় বড়বৌ, জেল হয়েছে আমার। আমার সারা জীবন গুপীদা'র গোলামী খাটলেও তার এই পাঁচ বছরের জেল খাটার ঋণ শোধ যাবে না।"

অতীত স্মৃতির উচ্ছ্বাসে মহামায়ার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল; কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, চোখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন, তোমার দাদা মরবার সময় কি বলে গিয়েছিল, মনে আছে ঠাকুরপো?"

একটা ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বৈদ্যনাথ উত্তর করিলেন, "মনে আছে বৈ কি বৌঠান!"

ঈষৎ তিরস্কার-তীব্র কণ্ঠে মহামায়া বলিলেন, "মনে থাকলে ভোলাকে আদর দেই বলে আমাকে কক্ষণো তিরস্কার করতে আসতে না ঠাকুরপো!"

উপেক্ষাসূচক মুখভঙ্গী করিয়া বৈদ্যনাথ বলিলেন, "চুলোয় যাক্

ঝগড়াঝাটি, এখন তুমি একটু বসতে পারবে কি? তোমার সঙ্গে কাজের কথা আছে।"

উৎসুকভাবে মহামায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি এমন কাজের কথা ঠাকুরপো?"

গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালনপূর্বক বৈদ্যনাথ বলিলেন, "কাল অফিস থেকে এসেই তোমাকে কথাটা বলব মনে করেছিলাম, কিন্তু হালদার মশায় এসে ডাকাডাকি করায় বলা হয়নি।....ভোলার বিয়ে দেবে?"

চমকিত ভাবে মহামায়া বলিলেন, "বিয়ে!"

বৈদ্যনাথ বলিলেন, "হাঁ গো, বিয়ে! দিব্যি একটি সুন্দরী মেয়ে পাওয়া যাচ্ছে, বছর দশ-এগারো বয়স, দেখতে যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীটি। নাক-মুখ-চোখ যেন তুলি দিয়ে তৈরি করেছে। গায়ের রং,—রাগ ক'রো না বৌঠান, তোমরা কাছে দাঁড়াতেই পারবে না।"

ঈষৎ হাসিয়া মহামায়া বলিলেন, "আমাদের রং কি ধর্তব্যের মধ্যে ঠাকুরপো? তোমার দাদা তো সময়ে সময়ে কালীঠাকরুণ বলে ডাকতেন।"

বৈদ্যনাথ বলিলেন, "সেটা তামাসা করে বলতেন! তা আমি গুমোর করে বলতে পারি বৌঠান, তেমন মেয়ে আমাদের এ তল্লাটে নেই। তবে দোষের মধ্যে কি জান, নগদ কিছু দিতেথুতে পারবে না।"

"দু,চার শ'ও না?"

"এক পয়সাও না।"

"বড় গরীব বুঝি?"

"গরীব বৈ কি! আমাদেরই অফিসে চল্লিশটি টাকা মাইনে পায়। দু'টি ছেলে, তিনটি মেয়ে। খেতে পরতেই কুলোয় না, দেবে কি? আর দেবার শক্তি থাকলে কি পাড়াগাঁয়ে মেয়ে দিতে চায়?"

"কেন পাড়াগাঁ কী এত মন্দ জায়গা?"

"জায়গা মন্দ নয়, কিন্তু তুমি জান না বৌঠান, শহুরের লোকেরা পাড়াগাঁয়ের নাম শুনলেই শিউরে ওঠে।"

চিন্তিতভাবে মহামায়া বলিলেন, "কিন্তু যতই সুন্দরী মেয়ে হোক ঠাকুরপো, শহুরে মেয়ের সঙ্গে ভোলার বিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না?"

সবিস্ময়ে বৈদ্যনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন হবে না?"

মহামায়া বলিলেন, "একে তো ভোলাকে নিয়ে জ্বালাতন হচ্ছি, তার উপর শহুরে মেয়ে ঘরে আনলে কি আর রক্ষে থাকবে? শহুরে মেয়েদের চালচলনই আলাদা। আমাদের পাড়াগাঁয়ের লোকের সঙ্গে তার বনিবনাও হবে না।"

দুঃখিতভাবে বৈদ্যনাথ বলিলেন, "কিন্তু ভাল হ'ত বৌঠান। মেয়েটি দিব্যি পছন্দসই, লোকটাও খুব কাতর হয়েই ধরে বসেছে।"

মহামায়া বলিলেন, "ধরলে কি হবে, শহুরের মেয়ে ঘরে আনা পোষাবে না। তাছাড়া এত তাড়াতাড়ি ভোলার বিয়ে দেওয়াও ঠিক নয়। পড়াশুনা করুক, রুজি-রোজগার করতে শিখুক।"

বৈদ্যনাথ হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "তুমি অবাক করলে বৌঠান! ভোলা রোজগার করতে শিখলে তবে তার বিয়ে দেবে?"

গম্ভীরমুখে মহামায়া বলিলেন, "তা নইলে বিয়ে করে তাকে খাওয়াবে কি?"

সহাস্যে মাথাটা নাড়িতে নাড়িতে বৈদ্যনাথ বলিলেন, "সে একটা ভাবনার কথা বটে!"

তাঁহার এই হাসিটুকুর মধ্যে শ্লেষের রেখা লক্ষ্য করিয়া মহামায়া ঈষৎ রাগতভাবে বলিলেন, "হাসির কথা নয় ঠাকুরপো, ভোলার বাপ এমন কি বিষয়-সম্পত্তি রেখে গিয়েছে যে, ভোলা বসে খেতে পারবে?"

বৈদ্যনাথ যেন খুব চিন্তিভাবে বলিলেন, "সত্যি, তেমন কিছু ভোলার বাপ ত' রেখে যায়নি। যাক্, তা হলে এখন ভোলার বিয়ে দিতে তোমার ইচ্ছে নেই?"

মহামায়া উত্তর করিলেন, "না। তবে তোমরা যদি ভাল বিবেচনা কর—"

বাধা দিয়া বৈদ্যনাথ বলিলেন, "আমার বিবেচনার কথা ছেড়ে দাও বৌঠান। আমার বিবেচনা মত কাজ করতে হলে সব উল্টে যায়। তা হলে জগন্নাথ মল্লিক আর বৈদ্যনাথ মল্লিকের যা কিছু আছে—যাক্, তোমার যখন শহুরে মেয়ে ঘরে আনতে ইচ্ছা নেই, তখন কথাটা এখানেই চাপা দেওয়া ভাল।"

বৈদ্যনাথ উঠিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

ভোলার বিবাহ দিবার ইচ্ছা মহামায়ার যে একেবারেই ছিল না, তাহা নহে। তাঁহার সন্তানসন্ততি না থাকায় ভোলাই তাঁহার পুত্রের স্থান অধিকার করিয়াছে। ভোলাই তাঁহার সর্বস্ব—একমাত্র মায়ার বাঁধন হইয়া পড়িয়াছে। ভোলাও জ্যেঠাইমা-অন্তপ্রাণ, জ্যেঠাইমাকে না দেখিলে তাহার একদণ্ডও চলে না। এজন্মে না হইলেও পূর্বজন্মে ভোলা বোধ হয় তাঁহার পেটের ছেলেই ছিল।

ভোলাকে দিয়াই মহামায়া সংসারের সকল সুখসাধ মিটাইয়া লইবার কল্পনা করিতেন। ভোলা আর একটু বড় হউক, খুব ধুমধামে উহার বিবাহ দিব, বিবাহ দিয়া একটি টুকটুকে বৌ ঘরে আনিব। তারপর সেই বৌকে লইয়া, ভোলাকে লইয়া, ভোলার ছেলেমেয়েদের লইয়া বেশ সুখের সংসার পাতিয়া বসিব। ছোটবৌয়ের সঙ্গে বনিবনা না হয়, নিজের অংশ বুঝিয়া লইব। আমার যাহা আছে তাহাই যে ভোলার পক্ষে যথেষ্ট।

মহামায়া নিজের গহনার বাক্স খুলিয়া বৌকে কি কি গহনা দিয়া সাজাইবেন তাহা ঠিক করিয়া লইতেন। তাঁহার বিবাহকলীন পিতৃদত্ত অলঙ্কারগুলি মজুত ছিল। সেগুলির মধ্যে কোন্-কোনগুলি ভাঙ্গিয়া যথাযথ অবস্থাতেই দেওয়া চলিবে আর কোনগুলিকে ভাঙ্গিয়া আধুনিক প্রণালীতে গড়াইয়া দিতে হইবে, ইহাও ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন।

ভোলার বিবাহের প্রতি এত ঔৎসূক সত্বেও তিনি যে আজ বৈদ্যনাথের প্রস্তাব প্রত্যাখান করিলেন, তাহা শুধু শহুরে মেয়ে বলিয়া নয়, ভোলার জন্য আজ আমোদিনীর সহিত ঝগড়াঝাটিতে এবং বৈদ্যনাথের কথায় তাঁহার মনটা তিক্ত হইয়া উঠীয়াছিল। তাই তিনি রাগে অভিমানে বৈদ্যনাথের কথা প্রত্যাখান করিয়া দিলেন।

বৈদ্যনাথও যে ভোলাকে জানিতেন না বা তাহার অপরাধ মার্জনীয় বলিয়া মনে করিতেন না, তাহা নহে। আদরযত্ন না করিলেও তিনি ভোলার প্রতি নিজ কর্তব্য বিস্মৃত হন নাই। ভোলার পিতার স্মৃতি, জ্যেষ্ঠের অন্তিম অনুরোধ তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক ছিল তবে দোষের মধ্যে—যে যখন যাহা বলিত, তাহাই তিনি নির্বিচারে সত্য ও স্বাভাবিক বলিয়া ধরিতেন, এবং তাহার প্রতিকারে উদ্যত হইতেন। কিন্তু পরক্ষণেই প্রতিকূল যুক্তি শ্রবণ করিলেই স্বীয় ধারণার পরিবর্তন করিয়া লইতে ইতস্তত করিতেন না। এবং তাঁহার ক্রোধ এক কথায় হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিয়া এক কথাতেই আবার নিবিয়া যাইত।

আমোদিনী যখন কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর নিকট অভিযোগ করিলেন যে, ভোলার অত্যাচার ক্রমে অসহনীয় হইয়া উঠীতেছে, এবং বড় গিন্নীর অতিরিক্ত আদরে সে অত্যাচারের মাত্রা ক্রমেই এত বাড়িতেছে যে, সুযোগ পাইলে ভোলা নরেশকে খুনও করিতে পারে, তখন বৈদ্যনাথ স্ত্রীর উক্তির সত্যাসত্যর বিচার না করিয়াই ভোলার উপর রাগিয়া উঠীলেন, রীতিমত শাসন করিয়া ভোলাকে এইরূপ অসহনীয় অত্যাচার হইতে বিরত করিবার জন্যে মহামায়ার কাছে আসিয়া ভোলাব বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন; কিন্তু মহামায়ার কথায় যখন বুঝিতে পারিলেন যে, স্ত্রীর অভিযোগ সত্য নহে, তখন বৈদ্যনাথ একেবারে জল হইয়া গেলেন। শাসনের পরিবর্তে তিনি ভোলার বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া বসিলেন।

মহামায়া কিন্তু এতটা তলাইয়া দেখিলেন না। বৈদ্যনাথকে

অকৃতজ্ঞ জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন।" অগত্যা বৈদ্যনাথ ক্ষুণ্ণমনে নিরস্ত হইতে বাধ্য হইলেন।

॥ সাত ॥

চাকর গোবর্ধন তখন নিয়মিত কাজকর্ম সারিয়া মোটা করিরা এক ছিলিম তামাক সাজিয়া লইয়াছিল, এবং খাজনা দিবার জন্য উপস্থিত প্রজা নফর মাইতিকে কাছে বসাইয়া তাহার গল্প ফাঁদিয়া বসিয়াছিল। এমন সময় ছোটবাবু বাহিরে আসিলে গোবরর্ধনের আর তামাক খাওয়া হইল না, সে তাড়াতাড়ি হুকা-কলিকা ফেলিয়া ছোটবাবুর আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল।

বৈদ্যনাথ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভোলা কোথায় রে গোবরা।"

গোবরর্ধন মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে উত্তর দিল; "কি জানি। ভোলা তো ইস্কুল থেকে এসেই বেড়াতে বেরিয়েছে।

বৈদ্যনাথ বলিলেন, "সে কোথায়, ছাখ দেখি!"

গোবর্ধন বিনা বাক্যব্যয়ে ভোলাকে দেখিবার জন্য বাহির হইল। বৈদ্যনাথ তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আজ এখনো হালদার মশায়েরও দেখা নেই। এখনি হালদার মশায়কে ডেকে দিয়ে যাবি বুঝলি?

গোবরর্ধন অন্ধকারেই স্বীকৃতিসূচক মস্তক আন্দোলন করিয়া প্রস্থান করিল। বৈদ্যনাথ বৈঠকখানায় নফর মাইতির বকেয়া খাজনার হিসাব দেখিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

হিসাব দেখা প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় যজ্ঞেশ্বর হালদার মহাশয় বাঁ হাতে লণ্ঠন লইয়া ডান হাতে লাঠিটা ঠক্‌ঠক্ শব্দে মাটিতে ঠুকিতে ঠুকিতে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন, এবং বৈদ্যনাথের

জিজ্ঞাসার পূর্বেই নিজের বিলম্বের কৈফিয়ৎস্বরূপ বলিলেন, 'আজ একটু হাঙ্গামায় পড়ে দেরী হয়ে গেল ছোটবাবু! আমিও বেরিয়ে আসছি, এমন সময় গোবরা গিয়ে হাজির।

বৈদ্যনাথ নফরকে খাজনার দাখিলা কাটিয়া দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঙ্গামাটা কি হালদার মহাশয়?"

হালদার মশায় আলো নিবাইয়া লণ্ঠনটা এক পাশে রাখিয়া আসন গ্রহণপূর্বক বলিলেন, "হাঙ্গামাটা কি জান ছোটবাবু, তোমাদের ভোলা, আমার মেজো ছেলে কেলো আর কতকগুলো ছোঁড়া মিলে কি এক খেলার দল করেছে। তা ছেলে বেলায় আমরাও তো খেলেছি, কিন্তু খেলতে তো কখনও পয়সার দরকার হয়নি। আজকালকার ছেলেদের এসব যত উদ্ভট্টি খেলা—খেলবে, তাতে টাকা চাই। তাও কি কম টাকা? প্রত্যেকের দু'টাকা করে চাঁদা পড়েছে।

বৈদ্যনাথ বলিলেন, "বলেন কি, দু'টাকা চাঁদা!

হালদার মশায় সবেগে মাথাটা একবার ঘুরাইয়া লইয়া বলিলেন, "তবে আর বলছি কি! তা গরীব বামুন, চালকলা বেঁধে খাই, দু'টাকা পাব কোথায়? বড় জোর দু'গণ্ডা পয়সা দিতে পারি। ছেলের কিন্তু দু'টাকা চাই-ই, নইলে ইয়ার মহলে মান থাকে না। তাই টাকা না পেয়ে অন্য চাবি দিয়ে গিন্নীর বাক্স খুলে একটা সোনার ফুল নিয়ে পোদ্দারের দোকানে দু'টাকায় বাঁধা দিয়েছে। তা কে এত তত্ত্ব জানে বল! আজ গিন্নী বাক্স খুলে ফুল দেখতে না পেয়ে একে ধরে তাকে ধরে। শেষে অনেক জুলুমের পরে কেলো দোষ স্বীকার করল। কাজেই কি করি দুটি টাকা আর তিনটি পয়সা সুদ দিয়ে গগন পোদ্দারের দোকান থেকে ফুলটি ছাড়িয়ে আনি।

বৈদ্যনাথ নফরকে বিদায় দিয়া দাবার ছক্ নিয়া বলিলেন, "তা হাঙ্গামা তো চুকে গিয়েছে, এখন আসুন, এক হাত খেলা যাক্।

বিষণ্নমুখে হালদার মশায় বলিলেন, "হাঙ্গামা চুকেছে বটে, কিন্তু মনটা বড়ই খারাপ হয়ে আছে। না-হোক দুটো টাকা গেল, কিছু মনে

করো না ছোটবাবু, তোমাদের ভোলাই হচ্ছে দলের সর্দার। সে-ই কোথা থেকে এই সব বিদ্‌ঘুটে খেলা এনে ছেলেগুলোকে মাতিয়ে তুলেছে। দুটো টাকা ছোটবাবু, ন দেবায় ন ধর্মায় গেল!

তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া সহাস্যে বৈদ্যনাথ বলিলেন, "আচ্ছা ভোলার জন্যই যদি আপনার এই ক্ষতি হয়ে থাকে, তা হলে না হয় আপনার ক্ষতি পূরণ করে দেওয়া যাবে।

হালদার মশায় বলিলেন, "যদি হয়ে থাকে কি, ভোলার দ্বারাই এই কাণ্ড হয়েছে, একথা আমি দিব্যি করে বলতে পারি। টাকা দুটি তো আমায় দিতেই হবে, তা ছাড়া ভোলাকে একট শাসন করেও দিতে হবে, ভবিষ্যতে এমন সব কাণ্ড আর না বাধায়।

বৈদ্যনাথ বলিলেন, "আচ্ছা আচ্ছা, তাকে বেশ করে বুঝিয়ে বলে দেব। এখন আসুন।

টাকা দুইটি পাইবার আশায় উৎফুল্ল হইয়া হালদার মশায় খেলিতে বসিলেন।

খেলা যখন বেশ জমিয়া উঠিতেছে, তখন ভোলানাথ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে ডেকেছ কাকাবাবু?

মুখ না তুলিয়াই বৈদ্যনাথ বলিলেন, "কে, ভোলানাথ!.... কিস্তি।

এই বলিয়া বৈদ্যনাথ হালদার মশায়ের রাজার সম্মুখে 'নৌকা টিপিয়া ধরিলেন। ভোলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া পুনরায় ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কি ডেকেছ?

সচকিতভাবে বৈদ্যনাথ বলিয়া উঠিলেন "হাঁ, ডেকেছি। দেখ, এমন সব কাজ আর তুমি করো না।...ও কি হালদার মশায়, গজ দিয়ে কিস্তি সামলাচ্ছেন, কিন্তু আপনার গজ যে এক্ষুণি যাবে ঘোড়ার আড়তে আছে, দেখতে পাচ্ছেন না?

মাথা নাড়িয়া হালদার মহাশয় বলিলেন, "আমার গজ গেলে

তোমার রাজাকে সামলাবে কি দিয়ে? ঘোড়া সরলেই দাবার কিস্তি পড়বে যে!

বৈদ্যনাথ নিবিষ্টচিত্তে রাজা সামলাইবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

কাকাবাবু কি কাজ করিতে নিষেধ করিলেন, তাহা আপাততঃ বুঝিয়া লইবার কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া ভোলানাথ ধীরে ধীরে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

॥ আট ॥

"জ্যেঠাইমা, ওগো জ্যেঠাইমা, শুনতে পাচ্ছো কি বড়মানুষের বেটী!"

মহামায়া নিজের ঘরের দাওয়ার এক পাশে বসিয়া মালা ঘুরাইতেছিলেন; ভোলার আহ্বানে গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "হুঁ!"

ভোলা একটু সরিয়া আসিয়া বলিল, "সাত ডাকের পর—হুঁ। ওখানে বসে হচ্ছে কি?"

ক্রুদ্ধস্বরে মহামায়া বলিলেন, "ফলার করছি, খাবি?

ভোলা বলিল, "হুঁঃ। খাবার জন্যই তো ডাকাডাকি করছি।

মহামায়া বলিলেন, "তবে আয়, আমার মাথাটা খেয়ে নে।

ভোলা হাসিয়া বলিল, "এমন খিদের সময় তোমার মাথা খেলে পেট ভরবে না জ্যেঠাইমা, তার চেয়ে উঠে একমুঠো ভাত দাও।

মহামায়া বলিলেন, "আমি এখন উঠতে পারব না, আমার কাজ শেষ হয়নি।

ভোলা বলিল, "বেশ তো যেটুকু বাকী আছে, আমাকে ভাত দিয়ে সেরে নেবে।

মহামায়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "আমি মালা শেষ না করে উঠতে পারব না। তুই সরে যা এখন এখান থেকে।

অবজ্ঞার স্বরে ভোলা বলিল, "তোমার হুকুমে নাকি ?

"হঁা, আমার হুকুমে।

"রেখে দাও তোমার হুকুম। আমার খুব খিদে পেয়েছে। ভাল চাও তো উঠে ভাত দাও। নয় তো তোমার ম লা খিড়কী পুকুরের জল সই করে দেব।"

গর্জন করিয়া মহামায়া বলিলেন, "দেখ ভোলা, তোর আস্পর্ধা সত্যি বড্ড বেড়ে গিয়েছে। ভাল চাস্ তো সরে যা বলছি।

জ্যেঠাইমার ক্রোধ ভোলার পরিচিত হইলেও আজিকার রাগটা যেন বড় বেশী বলিয়াই বোধ হইল। সেই রাগ দেখিয়া ভোলা যেন একটু ভয় পাইল। সে অপেক্ষাকৃত নম্রভাবে বলিল, "তুমি আজ বড্ডই রেগেছ দেখছি জ্যেঠাইমা।" বলিয়া ধীরে ধীরে নিজের পড়িবার ঘরের দিকে চলিল।

আমোদিনী নিজের ঘরের দরজা খুলিয়া ভোলাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আয় ভোলা, আমি ভাত দিচ্ছি।"

ভোলা ফিরিয়া তীব্র দৃষ্টিতে একবার তাঁহার দিকেই চাহিয়াই নিজের ঘরে চলিয়া গেল। আমোদিনী তখন মহামায়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেখলে দিদি, ছোঁড়ার কাণ্ড! আমি খেতে দিলে পছন্দ হবে না, আমার হাতে খাবে না।"

মহামায়া নিঃশব্দে দ্রুত মালা ঘুরাইতে লাগিলেন। তাঁহার নিকট উত্তর না পাইয়া আমোদিনী অপেক্ষাকৃত চড়া গলায় বলিলেন, "আমার হাতে তো খাবে না, কিন্তু খাচ্ছে কার ?

মহামায়া ধীরগম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "তোরই তো খাচ্ছে ছোটবৌ, কিন্তু সেজন্যে এত কথা কইছিস্ কেন ?"

আমোদিনী এবার সপ্তম স্বরে বলিলেন, "আমাকেই তুমি কথা কইতে দেখলে, আর ওই একরত্তি ছেলে যে আমার কথা না শুনে চলে গেল, সেটা দেখলে না। সাধে কি বলি তোমার একচোখো বিচার!"

উত্তর দিলেই কথা বাড়িয়া যাইবে বুঝিয়া মহামায়া চুপ করিয়া রহিলেন। আমোদিনী কিন্তু নিরস্ত হইলেন না। তিনি পক্ষপাতী বিচারক মাহামায়াকেই সাক্ষ্য মানিয়া দোষগুণের বিচার করাইবার উদ্দেশ্যে বলিলেন, "আচ্ছা তুমি তো ঠায় বসে রয়েছে, তুমিই বল না, দোষ কার? খিদে পেয়েছে, ভাত খাবে। তুমি মালা করছ, উঠতে পারবে না, তাই আমি তাড়াতাড়ি উঠে ভাত দিতে এলাম, কিন্তু কি ভাবে মুখ ভেংচিয়ে চলে গেল দেখলে তো?"

মহামায়া বলিলেন, "দেখেছি, কিন্তু তোকে তো ভাত দিতে বলে নি তুই দিতে এলি কেন?"

সপ্তমে গলা তুলিয়া আক্ষেপ সহকারে আমোদিনী বলিলেন, "অন্যায় হয়েছে আমার, ঝক্‌মারি করেছি। আমার ভাত আমার হাতে যে তেতো লাগবে, তা তো জানতাম না। জানলে কি এমন ঝক্‌মারির কাজ করতে আসি? কি আমার সাতপুরুষের গুরুপুত্ত্‌র রে!"

আপন মনে গর্জন করিতে করিতে আমোদিনী নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। মহামায়া নিঃশব্দে বসিয়া মালা ঘুরাইতে লাগিলেন।

খানিক পরে মহামায়া উঠিয়া আলো জ্বালিয়া ডাকিলেন, "ভোলা, ওরে ভোলা!"

ভোলা তখন পড়িবার ঘরে বসিয়া ইংলণ্ডের ইতিহাস মুখস্থ করিতেছিল। জ্যেঠাইমার ডাক শুনিলেও সে কোন উত্তর না দিয়া জোরে জোরে ইতিহাস আবৃত্তি করিতে লাগিল। দুই-তিন ডাকেও ভোলা যখন সাড়া দিল না, তখন মহামায়া তাহার ঘরের দরজায় গিয়া দাঁড়াইলেন, এবং ভোলাকে একটু ধমক দিয়া বলিলেন, "এত ডাকা-ডাকি করছি, শুনতে পাচ্ছিস্‌ না বুঝি?"

ভোলা পাঠ্যপুস্তক হইতে দৃষ্টি না সরাইয়া গম্ভীরমুখে উত্তর দিল, "কেন ডাকছ?"

ঝঙ্কারের সহিত মহামায়া বলিলেন, "ডাকছি আমার শ্রাদ্ধ করতে। আমার পিণ্ডি দিবি আয় না!"

একটু গম্ভীর হাসি হাসিয়া ভোলা হাসিয়া উত্তর করিল, "আমার নিজের পিণ্ডিই কে দেয় তার ঠিক নেই, আমি আবার পরের পিণ্ডি দেব!"

জোরে ধমক দিয়া মহামায়া বললেন, "মুখ সামলে কথা কইবি ভোলা! আমার সামনে যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!"

ভোলা নীরবে পাঠপুস্তকের পাতা উল্‌টাইতে লাগিল।

মহামায়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "উঠে আয়, আমি ভাত বাড়তে চললুম।"

ভারীমুখে ভোলা বলিল, "এখন আমি খাব না।"

"কেন খাবি না?"

"খিদে নেই।"

"এই না একটু আগে খিদের চোটে আমাব মালা নিয়ে পুকুরের জলে ফেলে দিতে চেয়েছিলি?"

ভোলা নিরুত্তর। মহামায়া তর্জন করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা ভোলা, তোরা আমাকে কি মনে করেছিস্ বল্ দেখি? আমি কি দাসীবাঁদী, যে যক্ষুণি যা হুকুম করবি, তক্ষুণি তাই করতে হবে, না করলেই রাগ!"

ভোলা পেন্‌সিলটা কুড়াইয়া লইয়া খাতার মলাটের উপর দাগ টানিতে লাগিল।

মহামায়া বলিলেন, "তা রাগ হয়, খেয়েদেয়ে রাগ করিস তখন। এখন উঠে আয়।"

মহামায়া গিয়া ভোলার হাত ধরিলেন। ভোলা মাথা তুলিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াই আবার মাথা নীচু করিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার চোখের কোণ ছাপাইয়া দুইবিন্দু অভিমানের অশ্রু গড়াইয়া খাতার উপর পড়িল। তাহা দেখিয়া মহামায়ার চোখ দুটাও সজল হইয়া উঠিল। তিনি জলভরা চোখে ভোলার অভিমানক্ষুব্ধ মুখের দিকে চাহিয়া স্নেহকোমল হাস্য সহকারে বলিলেন, "ছিঃ, ছিঃ! কি পাগলা

ছেলে তুই ভোলা, কি এমন শক্ত কথা বলেছি, তাতে তোর এত রাগ! উঠে আয়।"

ভোলা কঠোর দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার স্নেহকোমল মুষ্টি হইতে সবেগে হাতটা ছিনাইয়া লইল; দৃঢ়স্বরে বলিল, "কক্ষনো আমি খাব না।"

ভোলার এই একগুঁয়েমিতে মহামায়াও রাগিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "আচ্ছা, ক'দিন না খেয়ে থাকিস্ তাই দেখব।"

বলিয়া তিনি রুষ্টমুখে ঘরের বাহির হইয়া আসিলেন।

ভোলা আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িল।

॥ নয় ॥

মহামায়া পড়বার ঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমোদিনীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো এলে তাকে খেতে দিস্ ছোটবৌ, আমার বড্ড মাথা ধরেছে, শুতে যাচ্ছি।"

আমোদিনীর নিকট কোন উত্তর না পাইলেও উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই তিনি ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন।

শুইলেন বটে কিন্তু ঘুমাইলেন না, ভোলাকে লইয়া কি যে করিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। ভোলা কি এতক্ষণ ঘুমাইয়াছে? না পেটের জ্বালায় বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে? আর একবার গিয়া ডাকিব নাকি? এবার গিয়া ডাকিলে বোধ হয় আসিতে পারে। কিন্তু না, উহার স্পর্ধা বাড়িয়া গিয়াছে। উহা দূর করিয়া দেওয়া আবশ্যক। পুনরায় গিয়া ডাকা হইবে না। না ডাকিলে শেষে অপনিই আসিয়া ডাকাডাকি করিবে। পেটের জ্বালা সহ্য করিয়া আর কতক্ষণ থাকিবে?

মহামায়া উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন, কখন আসিয়া ভোলা ডাকাডাকি

করে। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, ভোলা আসিয়া ডাকিল না।

দণ্ডের পর দণ্ড অতীত হইতে লাগিল। রাত্রি বোধ হয় দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেল। মহামায়া পড়িয়া পড়িয়া শুনিতে পাইলেন, বৈদ্যনাথ বাড়ীতে আসিলেন, আমোদিনী উঠিয়া তাঁহাকে খাইতে দিলেন। আহার শেষ করিয়া বৈদ্যনাথ শুইয়া পড়িলেন। বাড়ীখানা নীরব নিশুতি হইল। কিন্তু কৈ, ভোলা তো আসিল না! তবে কি রাগে রাগেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে! মহামায়া ভাবিলেন, দূর হউক, সে রাগ করিয়া থাকে থাকুক, আমি গিয়া ডাকিয়া তাহাকে একমুঠো খাওয়াই।

মহামায়া উঠিয়া আলো জ্বালিলেন এবং আস্তে আস্তে দরজা খুলিয়া ঘরের বাহিরে আসিলেন। মহামায়া ভাবিতে লাগিলেন, জোরে দরজা খুলিলে সে শব্দে পাছে কাহারও ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, পাছে কেহ জানিতে পারে যে, তিনি এত রাত্রে উঠিয়া ভোলার রাগ ভাঙ্গাইবার জন্য সাধাসাধি করিতেছেন।

মহামায়া কিন্তু যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল। দরজা খোলার শব্দ না পাইলেও আলো দেখিয়া আমোদিনী সজাগ হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং মহামায়া ঘর ছাড়িয়া উঠানে নামিতেই তিনি জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে উঠলে গা,—দিদি?"

চমকিতভাবে মহামায়া উত্তর দিলেন, "হাঁ।"

"এত রাত্রে আলো নিয়ে কোথায় যাচ্ছ গা?"

ইতস্ততঃ করিয়া মহামায়া উত্তর দিলেন, "যাচ্ছি ভোলার তো এখনো খাওয়া হয় নি, তাই—"

সবিস্ময়ে আমোদিনী বলিয়া উঠিলেন, "সর্বনাশ! এখনো তার খাওয়া হয় নি? ভাত আছে, কিন্তু তরকারী তো কিছুই নেই। আমি তো জানিনা যে, তার এখনো খাওয়া হয় নি।"

মহামায়া যাইতে যাইতে থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। আমোদিনী বলিলেন, দুধও তো নেই। মুড়ি—তা শুধু মুড়িই একমুঠো যদি খায়—"

মহামায়া রোষতীব্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "ছাই খাবে!"

বলিয়াই তিনি সত্বরপদে নিজের ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন, এবং সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া আলো নিবাইয়া শুইয়া পড়িলেন।

সকালে পট্‌লা আসিয়া ভোলার ঘুম ভাঙ্গাইল; বলিল, "এখনো ঘুমুচ্ছিস্ যে? কাল অনেক রাত পর্যন্ত পড়েছিলি বুঝি?"

চোখ রগড়াইতে রড়াইতে ভোলা উত্তর দিল "হুঁ।"

পট্‌লা একটু উপহাসের হাসি হাসিয়া বলিল, "নাঃ, তুই দেখছি, জেলার হাকিম না হয়ে ছাড়বি না। এখন উঠে আয়, দরকার আছে।"

ভোলা হাই তুলিয়া আলস্য ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে বলিল, "সকালবেলা কি এমন দরকার রে পট্‌লা?"

পট্‌লা বলিল, "আয় না, রাস্তায় গিয়ে বলব।"

ভোলা উঠিয়া পট্‌লার অনুগম করিল।

রাস্তায় আসিয়া ভোলা কি দরকার জিজ্ঞাসা করিলে অনুচ্চস্বরে পট্‌লা বলিল, "মিত্তির বুড়োকে চিনিস্ তো? সেদিন আম পাড়তে গাছে উঠলে যে লাঠি দিয়ে তোকে তাড়া করেছিল?"

তাচ্ছিল্যের স্বরে ভোলা বলিল, "ওঃ, মিত্তির বুড়োকে আবার চিনি না? তাকে চিনি, তার মেয়ে নন্দরাণীকে চিনি, তার ঘরের টিক্‌টিকিকে পর্যন্ত চিনি।"

পট্‌লা বলিল, "তবে আর কি! আজ তাদের পুকুরধারে বড় আমগাছের আম পেড়ে খেতে হবে। বিস্তর আম পেকে রয়েছে!"

"কিন্তু আজ যদি আবার তাড়া করে?"

"কে তাড়া করবে? বুড়ো কাল বিকেল থেকে বাড়ীতে নেই।"

"ঠিক জানিস?"

"ঠিক না জেনে কি তোকে ডাকতে এসেছি ?"

সদম্ভে ভোলা বলিল, "চল্ তবে। বুড়ো সেদিন যেমন তাড়া করেছিল, আজ তার শোধ নেব। কেলোকে ডাকবি নাকি ?

পট্লা বলিল, "তার আর দরকার নেই। সে এলে একাই সব পেটে পুরে দেবে। বামুন ভারি পেটুক। তুই গাছে উঠতে পারবি তো ?"

"তা পারব।,'

"তবে আর কি, আমি তলা থেকে কুড়িয়ে নেব।"

যুক্তি স্থির করিয়া উভয়ে বীরদর্পে মিত্তির বুড়ো ওরফে বৃদ্ধ কৈলাস মিত্রের গাছে আম পাড়িতে চলিল।

॥ দশ ॥

"কে আম পাড়ছ গা ?"

ভোলা গাছে উঠিয়া বাছিয়া বাছিয়া পাকা আম নীচে ফেলিয়া দিতেছিল, পট্লা তাহা কুড়াইয়া কোঁচড়ে রাখিতেছিল। এমন সময় একটি বারো-তেরো বছরের গৌরবর্ণা ফুটফুটে মেয়ে বাঁ হাতে সকড়ি থালা-ঘটী, ডানহাতে গোবরজলের বালতি লইয়া ঘাটে উপস্থিত হইল।

ঘাটের অনতিদূরেই আমগাছ। দুইটা ছোঁড়াকে গাছ হইতে আম পাড়িতে দেখিয়া মেয়েটি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে আম পাড়ছ গা ?"

তাহার সাড়া পাইয়া ভোলা সঙ্কুচিত ভাবে ডালের আড়ালে লুকাইবার চেষ্টা করিল। পট্লা কিন্তু একটুও সঙ্কুচিত হইল না নির্ভীকভাবে উত্তর করিল, "মানুষ।"

"মানুষ তা তো দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আম পাড়ছ কেন ?"

· "খাব বলে।"

"খাবে বলে পরের গাছে আম চুরি করে পাড়তে এসেছ ?

"চুরি আবার কি ! গাছের ফল পাড়ছি, এ চুরি নাকি ?"

"চুরি না হোক, পরের গাছের ফল তো বটে। পরের জিনিস লুকিয়ে খেতে লজ্জা হয় না ?"

পট্‌লা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল ; বলিল, "খাবার জিনিস খাব, তাতে আবার লজ্জা কিসের ?"

মেয়েটি তাহার ঐরূপ উদ্ধত উক্তি শুনিয়া—থালা-বাসন-বালতি সেইখানে রাখিয়া গাছে দিকে অগ্রসর হইতে হইতে—ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "পরের জিনিস চুরি করে খেতে এসে আবার যা-তা বলা হচ্ছে ! তোমরা কি রকম ছোটলোক বল তো !"

পট্‌লা সদম্ভে উত্তর দিল, "আমরা ছোটলোক না তোমরা ছোটলোক ! গাছের ফল হাটে-বাজারে বেচতে পাঠাবে, তবুও পাঁচজনকে পাঁচটা খেতে দেবে না।"

চোরের এইরূপ জোর দেখিয়া মেয়েটির খুব রাগ হইল। কিন্তু রাগ হইলে কি হইবে, সে একা মেয়ে, উহারা দুইজন বলিষ্ঠ ছোকরা ; গায়ের জোরে উহাদিগকে পরাস্ত করা যাইবে না। বাবা বাড়ীতে নাই, খাঁদার মা রাত্রে তাহার কাছে শুইয়াছিল, সকালে উঠিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গিয়াছে। এদিকে এরা পাকা আমগুলি সব পাড়িয়া লইতেছে। আপাততঃ এই আম বেচিয়াই তাহাদের নুন-তেলের খরচা চলিতেছে, আমগুলি গেলে তাহাদের সংসার চলা দুষ্কর হইবে। অথচ ইহাদিগকে তাড়াইবারও উপায় নাই। রাগে দুঃখে মেয়েটির কান্না আসিল। সে পট্‌লার নিকটবর্তী হইয়া বলিল, "তোমাদের তো ভারী জোর দেখছি। পরের জিনিস জোর করে নিয়ে যাবে ?"

সদর্পে মাথা নাড়িয়া পট্‌লা উত্তর করিল, "নেবই তো।...কৈ রে ভোলা, শীগ্‌গীর পেড়ে ফেল্ না।"

মেয়েটি নিতান্ত নিরুপায় ভাবে ভারী গলায় চীৎকার করিয়া বলিল, "কৈ আম পাড় দেখি ?"

মুখভারী করিয়া পট্‌লা বলিল, "পাড়লে কি করবে ? মারবে ?"

জোর গলায় মেয়েটি বলিল, "হঁা মারব। খবরদার বলছি, আর আম পেড়ো না।"

ধুপ্ করিয়া একটা আম সম্মুখে পড়িল। মেয়েটি তাহা কুড়াইয়া লইলে পট্‌লা ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত হইতে উহা কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল। মেয়েটিও ছাড়িবে না, পট্‌লাও নাছোড়বান্দা। শেষে পট্‌লারই জয় হইল। কিন্তু মেয়েটির নখ লাগিয়া তাহার আঙ্গুলের এক জায়গায় একটু ছিঁড়িয়া গেল, সেখান হইতে রক্ত পড়িতে লাগিল। পট্‌লা তখন রাগে জ্ঞানশূন্য হইয়া একটা কঞ্চি কুড়াইয়া লইয়া মেয়েটিকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। মেয়েটি আর্তস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল।

ভোলা ঝুপ্ করিয়া গাছ হইতে নামিয়া পাড়িল, এবং কঞ্চি সমেত হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া তিরস্কারের স্বরে বলিল ছিঃ পট্‌লা, করিস্ কি !"

তাহার মুষ্টি হইতে হাতটা ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিতে করিতে পট্‌লা বলিল, "ছেড়ে দে ভোলা, ও কত বড় দস্যি মেয়ে দেখে নেব।"

ঈষৎ হাসিয়া ভোলা বলিল, "ও দস্যি মেয়ে, না তুই দস্যি ছেলে ? ছিঃ, মেয়ে মানুষের গায়ে হাত তুলতে আছে !"

পট্‌লা কট্‌মট্ করিয়া ভোলার মুখের দিকে চাহিল। তারপর কোঁচড়ের আমগুলি সেইখানে ছড়াইয়া ফেলিয়া আপন মনে গোঁ-গো করিতে করিতে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে ভোলা মেয়েটির দিকে চাহিয়া সান্ত্বনার স্বরে বলিল, "পট্‌লা ছোঁড়া ভারী রাগী ; একটুতেই ভয়ানক রেগে উঠে।"

মেয়েটি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি ভাগ্যিস এসে ধরে ফেললে, নইলে আমাকে ঠিক মারত।"

ভোলা বলিল, "সেই জন্যেই তো আমি তাড়াতাড়ি নেমে এসেছি।

এই দেখ, তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে হাতের এইখানটা ছড়ে গেছে।"

মেয়েটি ব্যগ্রদৃষ্টিতে তাহার ক্ষতস্থানের দিকে চাহিয়া ব্যস্ততার সহিত বলিল, "ওমা! রক্ত পড়ছে যে!"

উপেক্ষার স্বরে ভোলা বলিল, "পড়ুক। দুর্বোঘাস চিবিয়ে লাগিয়ে দিলেই রক্ত ধরে যাবে। এখানে তো দুর্বোঘাসও নেই!"

দূর্বাঘাসের অনুসন্ধানে ভোলা চারিদিকে চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মেয়েটি বলিল, "আমার সঙ্গে চল্, একটু তেল দিয়ে দেব। তেল দিলে এক্ষুণি রক্ত থেমে যাবে।"

ভোলা তাহার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিল না। সে ভূপতিত আমগুলি দেখাইয়া বলিল, "আমগুলো এখানে পড়ে থাকবে?"

ভোলা বলিল, "পড়ে থাকবে কেন? তুমি কুড়িয়ে নাও না।"

ভোলা বলিল, "আমি এত আম নিয়ে কি করব? তুমি নাও।"

মেয়েটি বলিল, "না না, তুমি কষ্ট করে পেড়েছ, ও আমি নেব কেন? তুমি নিয়ে যাও।"

ভোলা একটু আশ্চর্যান্বিত হইল। এই একটু আগে এই আমের জন্য মেয়েটি পটলার সঙ্গে কি লড়াই না করিতেছিল! আর এখন নির্বিবাদে তাহাকে সেই আমগুলি খয়রাৎ করিতেছে! বিস্মিতভাবে ভোলা আমগুলি কুড়াইতে কুড়াইতে বলিল, "আচ্ছা আমি কুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছি। তারপর তুমি অর্ধেক নেবে, আমি অর্ধেক নেব।"

মেয়েটি আর কিছু না বলিয়া সকড়ি বাসনগুলি ঘাটে ফেলিয়া রাখিয়াই ভোলাকে সঙ্গে লইয়া ব্যস্তভাবে বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

বাড়ীতে ঢুকিতে ঢুকিতে ভোলা জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা, তোমার নাম নন্দরাণী, না?"

উত্তরে মেয়েটি স্বীকৃতিসূচক মস্তক আন্দোলন করিল।

বাড়ীখানা খুব বড় না হইলেও নিতান্ত ছোটখাট নয়। অনেক দিনের পুরাতন বাড়ী। সংস্কার অভাবে চুন-বালি সব ঝরিয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে ইট খসিয়া পড়িয়াছে। প্রাচীরে বড় বড় ফাটল ধরিয়াছে,

মাথায় অশ্বত্থগাছ শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে। বাড়ীখানা দেখিলেই মনে হয়, এক সময়ে এই বাড়ীর অধিকারীর অবস্থা খুবই ভাল ছিল।

বাস্তবিকই বাড়ীর অধিকারী কৈলাস মিত্রের অবস্থা এক সময়ে এমন ছিল যে, লোকে বিপদে-আপদে পড়িলে রাজীব মল্লিকের দ্বারস্থ না হইয়া আগে কৈলাস মিত্রের দারস্থ হইত এবং দ্বারস্থ হইলে কাহাকেও কখনও বিমুখ হইয়া ফিরিতে হইত না। কলিকাতায় কৈলাস মিত্রের মস্ত পাটের কারবার ছিল। তাহার আয়ে বাড়ীতে দোল-দুর্গোৎসব বারো মাসে তেরো পর্বণ হইত। লোকজন, আত্মীয়-কুটুম্ব, অতিথি-অভ্যাগত লইয়া প্রত্যহ বাড়ীতে প্রায় পঞ্চাশখানা পাতা পড়িত। কন্যাদায়, মাতাপিতৃদায়ে লোকে বেশ সাহায্য পাইত; গৃহ-বিগ্রহ রঘুনাথের সেবায় পুরোহিতের সংসার চলিয়া যাইত। পূজার সময় কৈলাস মিত্র যখন পাল্কী হাঁকাইয়া বাড়ীতে আসিতেন, তখন গরীব কাঙ্গালদের মহলে হৈ-চৈ পড়িয়া যাইত, তাহাদের ছেলে-মেয়েরা নূতন কাপড় পাইবার আশায় কৈলাসবাবুর জয়ধ্বনি দিতে দিতে তাঁহার পাল্কীর আগে-পিছে ছুটিতে থাকিত।

কিন্তু অদৃষ্টচক্রের আবর্তন কখন কোন্ দিক দিয়া হয় তাহা বুঝা যায় না। কৈলাস মিত্রের ভাগ্যলক্ষ্মী সহসা চঞ্চলা হইয়া পড়িলেন। একবার পাটের দর এমন নামিয়া গেল যে, দুই-তিন বৎসরেরও দর আর উঠিল না। তাহাতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা লোকসান দিতে হইল। সঙ্গে সঙ্গে যে ব্যাঙ্কে টাকা জমা ছিল, হঠাৎ সে ব্যাঙ্ক ফেল হইয়া গেল। অগত্যা কারবার বন্ধ করিয়া দিতে হইল। কিন্তু তাহাতেও নিষ্কৃতি নাই, মহাজনের কাছে তখনও চল্লিশ হাজার টাকা দেনা। অনেকে তাঁহাকে আদালতে দেউলিয়া বলিয়া প্রমাণিত হইবার পরামর্শ দিল। কৈলাস মিত্র কিন্তু সে পরামর্শে কর্ণপাত করিলেন না; যাবতীয় ভূসম্পত্তি, এমন কি স্ত্রী-পুত্রের অলঙ্কার, পূজাপার্বণের ভারী ভারী থালা-বাসন পর্যন্ত বেচিয়া মহাজনের ঋণ শোধ করিলেন। পূজা পার্বণ, দানধ্যান বন্ধ হইয়া গেল, আত্মীয় কুটুম্ব কে কোথায় সরিয়া পড়িল, অতিথি অভ্যাগতের সংখ্যাও ধীরে ধীরে কমিয়া

আসিল। অবস্থার এইরূপ আকস্মিক পরিবর্তনে দুর্ভাবনায় নানাবিধ ব্যাধি আসিয়া কৈলাস মিত্রকে এমন ভাবে জড়াইয়া ধরিল যে, চাকরী করিয়া সংসার চালাইবার ক্ষমতাও রহিল না! যে সামান্য জমিজমা ছিল, তাহারই আয়ে কোনরূপ সংসার চলিতে লাগিল।

সংসারও অনেকটা হালকা হইয়া আসিল। দ্বাদশবর্ষীয় পুত্র মাসখানেক রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া, মা-বাপের বুকে শেল বিঁধিয়া দিয়া পরলোক গমন করিল। গৃহিণী পুত্রশোকে সেই যে শয্যা গ্রহণ করিলেন, সে শয্যা হইতে আর উঠিলেন না। তিন বছরের মেয়ে নন্দরাণীকে রাখিয়া তিনি পুত্রের অনুসরণ করিলেন। পুত্রশোকের উপর স্ত্রীবিয়োগের মর্মন্তুদ যাতনা অন্তরে চাপিয়া কৈলাসনাথ নন্দরাণীকে লালনপালন করিতে লাগিলেন।

যে জমিজমার আয়ে সংসার চলিতেছে, স্ত্রী-পুত্রেব চিকিৎসায় তাহারও কিয়দংশ হস্তান্তরিত হইয়া গেল। যাহা রহিল, তাহার ফসলে সারা বছরের ভাতটা চলিতে পারে। কিন্তু ভাত ছাড়া নুন, তেল, হাটবাজার, কাপড়চোপরে খরচ আছে। পুকুরের মাছ, গাছের আম, জাম, নারিকেল বেচিয়া সে খরচ চলিতে লাগিল। কৈলাসনাথ নিজে অবশ্য এ সকল বেচিতে যাইতেন না। সচ্ছল অবস্থায় কৈবর্তের মেয়ে বিধবা বিন্দী কৈলাসনাথের বাড়ীতে চাকরাণী হিসাবে কাজ করিত। এখন করে না, তবে প্রয়োজন মত সে এই সকল জিনিস হাটেবাজারে বেচিয়া আসে। এজন্য কিছু কিছু পয়সাও পায়।

শুধু পয়সার লোভে যে বিন্দী এ কাজ করিত তাহা নহে, অনেকটা নন্দরাণীর উপর স্নেহবশতঃই সে সেচ্ছায় বেগার খাটিত। নন্দরাণী ভূমিষ্ঠ হইবার পর আতুর ঘর হইতেই কেমন একটা মায়ায় বিন্দী আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। চাকরী ছাড়িলেও সেই মায়ার বাঁধনটুকু ছিন্ন করিতে পারে নাই। হাটেবাজারে গেলেই সে অন্ততঃ দুই পয়সার মোয়া-বাতাসা নন্দরাণীর জন্য কিনিয়া আনিত। বড় হইয়া নন্দরাণী তাহার জন্য পয়সা খরচ করিতে নিষেধ করিলেও সে কিন্তু দুইটা পয়সা

খরচ না করিয়া ছাড়িত না।

এইরূপে পিতার স্নেহযত্নে, আর কতকটা বিন্দীর সাহায্যে নন্দরাণী মানুষ হইতে লাগিল। দুঃখে শোকে কৈলসনাথের দেহ ক্রমেই জীর্ণ হইয়া আসিতেছিল। পিতার অবস্থা দেখিয়া নন্দরাণী আট-নয় বৎসর বয়স হইতেই গৃহস্থালীর কার্যে অভ্যস্ত হইতে লাগিল, এবং দুঃখ-কষ্টের মধ্যে প্রতিপালিত হওয়ায় সেই অল্প বয়সেই প্রায় সকল কার্যে পটু হইয়া উঠিল। এগারো বছরে সে রাঁধিয়া বাপকে খাওয়াইতে লাগিল। সংসারের কাজকর্ম সম্বন্ধে কৈলাসনাথ অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

কিন্তু এদিকে নিশ্চিন্ত হইলে কি হইবে, অন্য দিকে চিন্তার ভার গুরু হইয়া উঠিল। মেয়ে এগারো বছরে পড়িয়াছে, আর কয় মাস পরে বারোয় পড়িবে। আর তো বিবাহের চেষ্টা না দেখিলে চলে না। কৈলাসনাথ নন্দরাণীর বিবাহের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন, এবং দেখিতে দেখিতেই মেয়ে তেরো ছাড়িয়া চৌদ্দয় পা দিবার উপক্রম করিল।

শুধু পয়সাব জন্যই যে বিবাহের বিলম্ব হইতেছিল, তাহা নহে। যে সামান্য জমিজমা আছে, উহারই দুই-এক বিঘা বেচিয়া মেয়ের বিবাহ দিতে হইবে। তারপর নিজের একটা পেট কোন রকমেই চলিবেই। জমি বেচিয়া মেয়ে পার করিতে প্রস্তুত থাকিলেও কৈলাসনাথ নন্দরাণীর বিবাহ দিতে পারিতেছিলেন না। না-পারিবার অন্য কারণ ছিল।

॥ এগারো ॥

একটা পিঁজরায় দুইটা বাঘ থাকিতে পারে, কিন্তু এক গ্রামের ভিতর দুইজন ধনী লোক বাস করিতে পারে না। বাস করিলেও পরস্পর সদ্ভাবে কাটাইতে পারে না। বিবাদ-বিসংবাদ বাধাইয়া পরস্পর পরস্পরকে উচ্ছন্নে দিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টিত হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রে মানুষ হিংস্র জন্তু অপেক্ষা কতটা উন্নত, তাহা পণ্ডিতগণের গবেষণার বিষয়।

দাঁইহাটী গ্রামে দুইঘর সম্পন্ন লোক বাস করিত। এক ঘর তিনপুরুষে বড়লোক মল্লিকরা, আর এক ঘর একপুরুষে বড়লোক কৈলাস মিত্র। যখন একপুরুষে বড়লোকের ক্রিয়াকর্মে, দানধ্যানে তিনপুরুষে বড়লোক মল্লিকদের গৌরব-রবি ম্লান হইয়া আসিতে লাগিল, তখন রাজীব মল্লিক তীব্র ঈর্ষ্যাপূর্ণ নেত্রে কৈলাস মিত্রের এই উন্নতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ইহা পিপীলিকার পক্ষোদ্‌গমের সহিত উপমিত হইতে পারিবে কিনা ভাবিলেন। তিনি শুধু ইহা দেখিয়া বা চিন্তা করিয়া নিরস্ত ছিলেন না, ঝগড়া-বিবাদ, মামলা-মকদ্দমা বাধাইয়া কৈলাস মিত্রের এই উন্নতির মূল কতটা সুদৃঢ়, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেও চেষ্টিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কৈলাস মিত্র বড়ই চতুর ; তিনি আইন-আদালতের মর্ম অপেক্ষা ব্যবসা-বাণিজ্যের মর্মই ভালরূপ বুঝিতেন। কাজেই মামলা-মকদ্দমার ফাঁদে পা দিলেন না, বিবাদী সম্পত্তি রাজীব মল্লিকে ছাড়িয়া দিয়া পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইলেন। চেষ্টা নিষ্ফল হইলেও রাজীব মল্লিক কিন্তু ছাড়িলেন না, গ্রামে তুমুল দলাদলি বাধাইয়া দিয়া কৈলাস মিত্রের প্রভাব-প্রতিপত্তি নষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন। সে ক্ষেত্রেও কৈলাস মিত্র কিন্তু মাথা তুলিয়া দাঁড়াইলেন না, অবনতমস্তকে বিপক্ষ রাজীব মল্লিকের মস্তকেই দলাদলির বিজয়-মুকুট পরাইয়া দিলেন। এইরূপে বারবার বিজয়লাভেও আপনাকে পরাজিত জ্ঞান করিয়া কৈলাস মিত্রের অধঃপতনের উপায় চিন্তা করিতে করিতেই রাজীব মল্লিক ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলেন।

তিনি গেলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ঈর্ষ্যাপ্রবৃত্তি তাঁহার সঙ্গেই বিলুপ্ত হইল না। তাঁহার অবর্তমানে তদীয় পুত্র জগন্নাথ পৈতৃক সম্পত্তি সহিত এই প্রবৃত্তিরও উত্তরাধিকারী হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার গোমস্তা গোপী রায়ও প্রভুর নিষ্ফল চেষ্টাকে সফল করিবার জন্য কৈলাস মিত্রের ছিদ্রান্বেষণ করিতে লাগিল। ছিদ্র এবার সহজেই মিলিল। কারবারে লোকসান দিয়া, মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিয়া কৈলাস মিত্র তখন সর্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাজীব মল্লিক যাহা খুঁজিতেছিলেন,

অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় আপনা হইতেই তাহা সংঘটিত হইলেও জগন্নাথ বা গোপী রায় ইহাতেও সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। বড় গাছটা ঝড়ে পড়িয়া গেলেও বড় গাছই নাম থাকে, ঝড়ে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে বলিয়া কেহ তাহাকে ছোট গাছ বলে না। জগন্নাথ বড় গাছের এই 'বড়' নামটাকে ঢাকিয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

বিন্দী দাসীবৃত্তি করিলেও নিতান্ত কুরূপা ছিল না, এবং বয়সও তাহাব যায় নাই। সে রাস্তা দিয়া চলিয়া গেলে অনেকেই তাহার দিকে লালসাপূর্ণ কটাক্ষপাত না করিয়া থাকিতে পারিত না। চাকরী ছাড়িলেও বিন্দী যখন কৈলাস মিত্রের বাড়ীতে সর্বদা যাতায়াত করিত ও প্রয়োজন মত বেগার খাটিত, গ্রামের অনেক ভদ্রলোকই এই বিধবা কৈবর্তেব মেয়েব চরিত্র সম্বন্ধে একটা ঘৃণিত ধারণা না করিয়া থাকিতে পারিল না। কৈলাস মিত্রের সহিত বিন্দী দাসীর একটা অবৈধ সংস্রব আছে কিনা, অনেকেরই মনে এই সন্দেহটা ধূমায়িত হইতে থাকিল। সুযোগ পাইয়া জগন্নাথ ও গোপী রায় ইহাতে ইন্ধন যোগাইয়া ধূমায়িত সন্দেহকে সহজেই সত্যরূপে জ্বালাইয়া তুলিলেন। গ্রামের মধ্যে নিন্দার একটা কোলাহল পড়িয়া গেল। তখন সমাজের ব্রাহ্মণ-কায়স্থবর্গ মিলিত হইয়া কৈলাস মিত্রের সহিত সর্ববিধ সংস্রব ত্যাগ করিবার অভিপ্রায়ে যদু বোসের মাতৃশ্রাদ্ধে তাঁহার নিমন্ত্রণ বন্ধ করিয়া দিলেন।

এই মিথ্যা কলঙ্কে নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেও আপনার বর্তমান অবস্থা স্মরণে কৈলাস মিত্র কাহাকেও কিছু বলিলেন না, শুধু নীরবে গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। আর বিন্দী দাসী রাগে জ্ঞানশূন্য হইয়া মুখ ছুটাইয়া দিল, এবং দিন কতক হাটে মাঠে ঘাটে সমাজপতি-গণের মস্তক ভক্ষণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া যখন দেখিল তাহার যথেষ্ট ইচ্ছা সত্বেও সমাজপতিগণের মস্তক অক্ষতভাবেই যথাস্থানে সন্নিবেশিত রহিয়াছে, তখন আপনা হইতেই চুপ করিয়া গেল।

এইরূপ মিথ্যা কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়াও বিন্দী কিন্তু প্রভুর বাটীতে যাতায়াত পরিত্যাগ করিল না। কৈলাসনাথ শঙ্কিত হইয়া বিন্দীকে

নিষেধ করিরা বলিয়া দিলেন, "আর কেন তুই এখানে আসিস্ বিন্দী ?"

বিন্দী রাগে হাত-মুখ নাড়িয়া বলিয়াছিল, "ক্যানে আসব না গা, ঐ আঁটকুড়ের ব্যাটাদের ভয়ে নাকি ? যে যাই বলুক, বিন্দী যদ্দিন বেঁচে থাকবে, তদ্দিন তাকে কেউ এ দোর থেকে তাড়াতে পারবে না।"

বিন্দীর এতটা দৃঢ়তার উপর কৈলাসনাথ আর তাহাকে নিষেধ করিতে পারিলেম না। বিন্দী যেমন যাওয়া-আসা করিতেছিল তেমনিই করিতে লাগিল।

কৈলাসনাথ যদি সমাজপতিগণের নিকট গিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন বা কিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য দণ্ড দিতেন, তাহা হইলে হয়তো তিনি ক্ষমা পাইতেন। কিন্তু সমাজের অন্যায় বিচারে তিনি এমনই মর্মাহত হইয়া পড়িলেন যে, অবিচার সমাজের নিকট মস্তক অবনত করা অপেক্ষা সমাজচ্যুত হইয়া থাকা শ্রেয়ঃ বোধ করিলেন।

. নন্দরাণী ক্রমে যখন বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিল, তখনই কিন্তু গোল বাধিল। যে সমাজের অন্যায় বিচারে ক্ষুব্ধ হইয়া কৈলাসনাথ সমাজের শাসনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন, এখন সেই সমাজ-শাসনই নন্দরাণীর বিবাহে ঘোর অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল ; সমাজচ্যুত ব্যক্তির কন্যাকে কেহই গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইল না। বহু চেষ্টায়ও কৈলাসনাথ কৃতকার্য হইতে পারিলেন না।

এদিকে মেয়ে ক্রমে তেরো ছাড়িয়া চৌদ্দয় পা দিল। কৈলাসনাথ স্বঘরে না হউক, অসমান ঘরেও কন্যাদান করিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু সামাজিক কলঙ্ক প্রতিকূল থাকায় তাঁহার এ চেষ্টাও সফল হইবার সম্ভাবনা দেখা গেল না। কৈলাসনাথ তখন আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়া সমাজের নিকট অবনতমস্তকে ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন কিনা তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

পুরোহিত যজ্ঞেশ্বর হালদার পরামর্শ দিলেন, "বিন্দীর সংস্রব ত্যাগ করে একটা প্রায়শ্চিত্ত কর, সকল গোল চুকে যাবে।"

কৈলাসনাথ প্রায়শ্চিত্ত করিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু বিন্দীর সংস্রব ত্যাগ করা দুঃসাধ্য বোধ করিলেন। হালদার মহাশয় তাঁহার মনোভাব অবগত হইয়া বিরক্তি সহকারে বলিলেন, "তবে আর দিনকতক ঘুরে ফিরে দেখ। কিন্তু ঢেঁকি যতই মাথা নাড়া দিক মিত্তির দা, গড়ে এসে তাকে পড়তেই হবে।"

গড়ে যে পড়িতে হইবে ইহা অবশ্যম্ভাবী জানিলেও কৈলাসনাথ আরও কিছুদিন ঘুরিয়া ফিরিয়া চেষ্টা দেখিবেন স্থির করিলেন।

দাবার ওপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া ভোলানাথ জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের বাড়ীটা এমন ভাঙাচোরা কেন?"

একটু লজ্জিতভাবে নন্দরাণী উত্তর দিল, "অনেক দিন মেরামত হয় নি।"

ভোলা। তোমার বাবা মেরামত করেন নি কেন?

নন্দ। পয়সার অভাবে মেরামত হয় নি।

ভোলা। বাড়ীঘর মেরামত করবার পয়সা নেই! তোমরা বুঝি খুব গরীব?

নন্দ। বাবা আগে খুব বড়লোক ছিলেন।

ভোলা। তোমাদের বাড়ীতে আর কে আছেন?

নন্দ। আর কেউ নাই।

ভোলা। আর কেউ নাই! তুমি তবে একা আছ?

নন্দ। রাত্রে বিন্দী এসে কাছে শোয়।

ভোলা। বিন্দী কে?

নন্দ। ও পাড়ার কৈবর্ত্তদের বিন্দী। আগে সে আমাদের ঘরে চাকরী করত। এখন কিছু করে না।

কথা শেষ করিয়া নন্দরাণী সত্বরপদে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তেলের বাটী আনিল, এবং ভোলার কাছে গিয়া কোমল স্বরে বলিল, "কৈ তোমার হাতটা দেখি।"

ভোলা হাতটা আগাইয়া দিলে নন্দরাণী তাহার ক্ষতস্থানে আস্তে.

আস্তে তেল লাগাইয়া দিতে লাগিল।

তেল দেওয়া শেষ হইলে ভোলা হাতটা টানিয়া লইয়া কোঁচড়ের আমগুলি বাহির করিয়া বলিল, "আমগুলো নাও তা'হলে।"

নন্দরাণী বলিল, "না না, আম নিয়ে কি করব? তুমি খাও।"

ভোলা বলিল, এতগুলো আম কি খেতে পারি?"

নন্দরাণী বলিল, "দু-পাঁচটাও তো খাওয়া যায়।"

ঈষৎ হাসিয়া ভোলা একটা আম লইয়া বলিল, "আচ্ছা, আমিই খেলেই যদি সন্তুষ্ট হও, তবে খাচ্ছি।"

নন্দরাণী বলিল, "থাম তবে। অমন করে খোসাসুদ্ধ আম কি খাওয়া যায়?"

নন্দরাণী তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে প্রবেশ করিল এবং বঁটি আনিয়া আম ছাড়াইয়া দিতে লাগিল।

ভোলা পা তুলিয়া বসিয়া একটার পর একটা আম শেষ করিতে আরম্ভ করিল।

পাঁচ-সাতটা আম খাইয়া ভোলা বলিল, "এইবার হয়েছে তো?"

সহাস্যে নন্দরাণী বলিল, "হয় নি এখনো। এ আমগুলো তেমন সুবিধে নয়। থাম একটু। ঘরে ভাল আম আছে।"

নন্দরাণী ঘর হইতে কতকগুলি ভাল আম বাছিয়া আনিল। অনাহারে রাত্রি যাপন করায় ভোলার জঠরানল যথেষ্ট প্রজ্বলিত হইয়াছিল। সুতরাং নন্দরাণীর সযত্ন-প্রদত্ত আম্ররসের দ্বারা সে অনল নির্বাপিত হইতে লাগিল।

এইরূপে কতকগুলি সুপক্ক আম উদরস্থ করিয়া ভোলা উঠিয়া দাঁড়াইল।

নন্দরাণী বলিল, "তোমার সঙ্গীর জন্যে কিছু নিয়ে যাবে না?"

ভোলা বলিল, "তার ভাগসুদ্ধ আমি পেটে পুরে দিয়েছি।"

বলিয়া সে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। নন্দরাণী আমের চুপড়ি ঘরে তুলিয়া গৃহকর্মে প্রবৃত্ত হইল।

রাস্তায় পট্‌লা দাঁড়াইয়াছিল। ভোলাকে দেখিয়া সে তীব্র শ্লেষের স্বরে বলিল, "নেমন্তন্ন খাওয়া হ'ল ?"

ভোলা হাসিয়া উত্তর করিল, "আমার হ'ল, কিন্তু তুই ফাঁকে পড়ে গেলি।"

রোষগম্ভীর-মুখে পট্‌লা বলিল, "আমি তো তোর মত পেটুক নই যে, যার তার ঘরে বসে খেতে যাব। ওরা একঘরে, তা জানিস্ ?"

সহাস্যে ভোলা বলিল, "খুব জানি, কিন্তু একঘরে লোকের জিনিস চুরি করে খেলে দোষ হয় না বুঝি ?"

ভারীমুখে পট্‌লা বলিল, "হুঁ গাছের ফল পেড়ে খেলে বুঝি দোষ হয় ? ওদের ঘরে বসে খেলেই দোষ।"

ভোলা বলিল "এটা বুঝি তোর মন-গড়া বিধান ?"

ভ্রুকুটি করিয়া পট্‌লা বলিল, "দাঁড়া, ইস্কুলে সব ছেলেকে বলব তুই ওদের ঘরে খেয়েছিস্। সবাই কি বলে শুনিস্।"

ক্রুদ্ধভাবে ভোলা বলিল, "বল্ গিয়ে। যে-যা বলে বলুক। খেয়েছি, তাতে হয়েছে কি ? ওরা হাড়ি নয়, মুচি নয়, কায়েত তো বটে।"

উপহাসের স্বরে পট্‌লা বলিল, "তোকে বলেছে কায়েত ! ওরা এখন কৈবর্ত হয়ে গেছে।"

হাসিতে হাসিতে তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া ভোলা বলিল, "দূর বোকা, কায়েত বুঝি কৈবর্ত হয় ?"

গম্ভীরমুখে পট্‌লা বলিল, "হয় বৈ কি ! চল্ দেখি, আমার জ্যেঠামশায়ের কাছে।"

ভোলা বলিল, "আচ্ছা তা যাব পরে। এখন চল্ ইস্কুলের বেলা হয়ে যাচ্ছে।"

সে পট্‌লাকে টানিয়া লইয়া বাড়ীর দিকে চলিল।

॥ বারো ॥

"মা নন্দরাণী !'

"কেন বাবা ?"

"রাত এখন কত হবে বল দেখি ?"

একটু ভাবিয়া নন্দবাণী উত্তর করিল, "রাত বোধ হয় সাতটা-আটটা হবে।"

ঈষৎ হাসিয়া কৈলাসনাথ বলিলেন, "সাতটা আর আটটা যে খুব কাছাকাছি নয় মা, একটি ঘণ্টার তফাৎ !"

লজ্জিতভাবে নন্দরাণী বলিল, "ঘড়ি না দেখলে ঠিক বলা যায় না বাবা ! যখন ঘরে ঘড়ি ছিল—"

পিতার বেদনা-বিবর্ণ মুখের দিকে লক্ষ্য পড়িতেই নন্দরাণী কথাটা শেষ করিতে পারিল না। কৈলাসনাথ একটা ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "যখন ঘরে ঘড়ি ছিল, তখনকার কথা ছেড়ে দাও নন্দ। এখন বোধ হয় আটটা বাজে। আজকাল তো সাতটায় সন্ধ্যা হয় ; রাত এক ঘণ্টা হয় নি ?"

নন্দরাণী বলিল, "তা খুব হয়েছে বাবা !"

সদর-দরজার পানে চাহিয়া একটু চিন্তিতভাবে কৈলাসনাথ বলিলেন, "কিন্তু ঘটকঠাকুর এখনও আসছে না কেন ? সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যে আসবার কথা !"

নন্দরাণী নীরবে বসিয়া আলুর খোসা ছাড়াইতে লাগিল। কৈলাসনাথ বলিলেন, "ভদ্রলোক ত্'জন আসবে, তাদের কোথায় বা বসাব ! সেদিনকার ঝড়বৃষ্টিতে বৈঠকখানার যে অবস্থা হয়েছে—"

মুখ না তুলিয়াই নন্দরাণী বলিল, "আগে তো জানতাম না বাবা। জানলে পরিষ্কার করে রাখতাম।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কৈলাসনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিন্দী আজ আম বেচে কত পয়সা দিয়ে গিয়েছে ?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া নন্দরাণী বলিল, "আম আজ বেচতে দেওয়া হয় নি।"

কথাটা বলিতে নন্দরাণী সঙ্কুচিত হইতেছে দেখিয়া কৈলাসনাথ মৃদুহাস্য সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেউ চাইতে এসেছিল বুঝি ?"

নন্দরাণী বলিল, "চাইতে আসে নি, তবে আম পাড়তে এসেছিল—"

নন্দরাণী তখন ভোলা ও পট্‌লা কর্তৃক আম পাড়া হইতে ভোলার আম খাওয়া পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা পিতার নিকট বলিল।

সব কথা শুনিয়া কৈলাসনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "এই কথাটা বলতে এত ইতস্ততঃ কর্‌ছিলি নন্দ ?"

নন্দরাণী একটু লজ্জার হাসি হাসিয়া ক্ষিপ্রহস্তে আলুগুলি কুটিতে লাগিল। কৈলাসনাথ চাপা হাসির সঙ্গে নন্দরাণীকে যেন একটু তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "ছোঁড়াকে আমগুলো খাইয়ে কাজটা কিন্তু ভাল করনি বাছা। একে তো চোরকে প্রশ্রয় দেওয়া ভাল নয়, তার উপর এই আমগুলো বিক্রী করলে অন্ততঃ দু'দিনের নুন-তেলের পয়সা হ'ত।"

পিতার দিকে হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নন্দরাণী বলিল, ইদানীং তুমি এত হিসাবী হয়েছ জানলে আমগুলো আমি নষ্ট করতাম না বাবা।"

কৈলাসনাথ হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "আমাকে কোন্ খানটা বেহিসাবী দেখলে বল তো ?"

নন্দরাণী বলিল, "ক'টার কথা বলব ! এই যে সেদিন জমি বেচে টাকা নিয়ে এলে তার দুটো টাকা হীরে ব্যাটাকে দিয়ে ফেললে !"

"সাধে কি দিয়েছি ? হীরে ব্যাটা আজ দু'মাস অসুখে ভুগছে, পয়সার অভাবে ওষুধ খেতে পারে না।"

"সে ওষুধ খেতে পারে না, তাতে তোমার কি বাবা? এই সেদিন তোমার জ্বর হ'ল, কিন্তু পয়সার অভাবে ওষুধ এল না। তোমাকে কে পয়সা দিলে বাবা?"

উচ্চহাসি হাসিয়া কৈলাসনাথ বলিলেন, "আরে পাগলী মেয়ে! আমি চিরকাল দিয়ে এসেছি, আমাকে আবার দেবে কে?"

গম্ভীরমুখে নন্দরাণী বলিল, "যখন দেবার মত অবস্থা ছিল, তখন দিয়ে এসেছ। এখন তো সে অবস্থা নেই।"

সহাস্যে কৈলাসনাথ বলিলেন, "অবস্থা নেই, কিন্তু স্বভাব তো আছে। জান তো 'ইজ্জৎ যায় ধুলে, স্বভাব যায় মলে।' আমি না মরলে আমার স্বভাব যাবে না নন্দ!"

মরণের কথায় নন্দরাণী রাগিয়া তর্জন সহকারে বলিল, "কে তোমার স্বভাব যেতে বলেছে, আর মরতেই বা বলছে বল তো?"

দুঃখবিমলিন হাস্য সহকারে কৈলাসনাথ বলিলেন, "মরতে কেউ বলে না মা, কিন্তু যে কৈলাস মিত্তিরের বাগানের আম-কাঁঠাল কত লোকে না-ব'লে পেড়ে নিয়েছে, সারা গাঁয়ের লোক পেট পুরে খেয়েছে, তুমি দশটা আম কাউকে খাইয়েছ বলে সেই কৈলাস মিত্তিরই আজ তোমাকে তিরস্কার করেছে। এতেও কি মনে কর নন্দ, কৈলাস মিত্তির এখনো বেঁচে আছে!"

এমন সময় বাহির হইতে ডাক আসিল, "কৈলাসবাবু!"

"এই এসেছে!" বলিয়া কৈলাসনাথ ব্যস্ততার সহিত উঠিয়া পড়িলেন, এবং মেয়েকে রান্নাঘরে যাইতে বলিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেলেন।

অল্পক্ষণ পরেই ঘটকের সহিত জনৈক প্রৌঢ়বয়স্ক ভদ্রলোককে সঙ্গে লইয়া কৈলাসনাথ ফিরিয়া আসিলেন।

॥ তেরো ॥

সীতাপুরের ধনঞ্জয় ঘোষের মত মহাজন সে দেশে আর একজনও ছিল না! লোকে বলিত, ধনঞ্জয়বাবুর কারবারে লাখ টাকা খাটিতেছে। লাখ টাকা না হইলেও বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা তাঁহার কারবারে খাটিতেছিল। বৎসরের যে সুদ আদায় হইত, একজন ডেপুটিবাবু সারা বৎশর খাটিয়া তত টাকা উপার্জন করিতে পারেন কি না সন্দেহ, এবং তদ্দারা যে-কোন ভদ্র গৃহস্থের বেশ বাবুয়ানী চালে চলিয়া যাইতে পারিত। ধনঞ্জয়বাবুর বাবুয়ানী চালচলন কিন্তু একটুও ছিল না; খুব মোটামুটি চালেই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন। এজন্য লোকে তাঁহাকে কৃপণ আখ্যা দিলেও তিনি আপনার চালচলনের কিছুমাত্র পরিবর্তন করেন নাই। ইহাতে মা লক্ষ্মী দিনে দিনে তাঁহার ঘরে যেন উছলিয়া উঠিতেছেন।

মা লক্ষ্মীর অগাধ কৃপাসত্বেও ধনঞ্জনয়বাবু কিন্তু সুখী ছিলেন না; মা যষ্ঠীর কৃপা হইতে তিনি সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিলেন। স্ত্রী কাদম্বিনী দাসী দেশের যেখানে যত সন্তান হইবার ঔষধ ছিল, সমস্তই সংগ্রহ করিয়া গলায় ও কোমরে বাঁধিয়া স্বীয় মাংসপিণ্ডবহুল দেহভারকে যৎপরোনাস্তি ভারগ্রস্থ করিয়া তুলিয়াছিলেন। তা ছাড়া স্বামীর বাহু ও কটিদেশকেও কবচ-মাত্নলীর ভারে ভারাক্রান্ত করিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু বিধাতার একই আঁচড়ে দম্পতির এই গুরুভার বহন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া পড়িয়াছিল। ঔষধ সংগ্রহ করিতে করিতে কাদম্বিনীর বয়স ত্রিশ এবং ধনঞ্জয়বাবুর বয়স চুয়াল্লিশ অতিক্রম করিলেও তাঁহাদের অপত্য-মুখ সন্দর্শনের কোন লক্ষণই দেখা গেল না। কাজেই ধনঞ্জয়বাবুর অবর্তমানে তাঁহার এই অগাধ অর্থরাশি কে ভোগ করিবে তাহাই ভাবিয়া শুধু

ধনঞ্জয়বাবু নয়, তাঁহার আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবেরাও নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন।

পরিশেষে অনেকে ধনঞ্জয়বাবুকে পরামর্শ দিলেন, বংশ রক্ষার্থ ধনঞ্জয়বাবুর দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করা আবশ্যক। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ধনঞ্জয়বাবু এই পরামর্শ শ্রেয়ঃ বলিয়া বোধ করিলেন এবং কাদম্বিনীর সম্মতি লইয়া এই পরামর্শ অনুসারে কার্যকরিতে প্রস্তুত হইলেন।

কাদম্বিনী কিন্তু ইহাতে মত দিলেন না। ধনঞ্জয়বাবু তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন, মহাভারত হইতে জরৎকারু মুনির উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়া বংশ রক্ষার অত্যাবশ্যকতা বুঝাইয়া দিলেন, তাঁহার নামে দশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ করিয়া দিবেন বলিয়া লোভ দেখাইলেন। কাদম্বিনী কিন্তু কিছুতেই ভুলিলেন না। দশ হাজার টাকার লোভে সপত্নী-কণ্টক ঘরে আনিয়া স্বামীর বংশরক্ষার আনুকূল্য করিতে রাজী হইলেন না। তাঁহাকে রাজী করিতে না পারিয়া ধনঞ্জয়বাবু অতিশয় বিপন্ন ও নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। স্বামীর কাতরতা দর্শনে কাদম্বিনী তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "তুমি কিছু ভেবো না, অনেক ভাল গণৎকার আমার হাত দেখে বলেছে, আমার ছেলে হবেই হবে। তবে একটু বেশী বয়সে হবে।"

ধনঞ্জবাবু কিন্তু গণৎকারের গণনার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারিলেন না; কাদম্বিনীর অসম্মতিসত্ত্বেও দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহে উদ্যোগী হইলেন, এবং পাত্রীর অনুসন্ধানার্থ ঘটক নিযুক্ত করিলেন। কাদম্বিনী সে সংবাদ পাইয়া স্বামীকে ভয় দেখাইয়া বলিলেন, "তুমি যদি বিয়ে কর, তা'হলে আমি আফিং খাব, গলায় দড়ি দিয়ে মরব।"

ধনঞ্জয়বাবু কিন্তু তখন বংশরক্ষার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সুতরাং স্ত্রীর ভীতি প্রদর্শনকে সম্পুর্ণ উপেক্ষা করিয়া স্পষ্ট জবাব দিলেন, "পুত্রার্থে ক্রিয়াতে ভার্যা, পুত্র পিণ্ডপ্রয়োজনং। তোমার যখন ছেলে হ'ল না, তখন তুমি মরলেই বা কি, বেঁচে থাকলেই বা কি!"

স্বামীর এই কঠোর উত্তরে কাদম্বিনী ক্রুদ্ধা ফণিনীর ন্যায় গর্জন করিয়া বলিলেন, "আমি তা বলে সহজে মরব না, তুমি যাকে ঘরে আনবে, তাকে বিষ খাইয়ে কিংবা গলা টিপে মেরে তবে নিজে মরব।"

কাদম্বিনীর দ্বারা এরূপ সাহসের কার্য সম্পন্ন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ইহা নিশ্চিত বুঝিয়া ধনঞ্জয়বাবু সোৎসাহে বিবাহের চেষ্টায় মনোনিবেশ করিলেন। কাদম্বিনীও এই বিবাহে বাধা দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন।

বয়স হইলেও পয়সার জোরে পাত্রীর অভাব হইল না, কিন্তু বিবাহকার্য সম্পন্ন হওয়া দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। যেখান হইতে সম্বন্ধ আসে, কাদম্বিনী গোপনে গোপনে লোক লাগাইয়া সেখানেই ভাঙানী দিতে লাগিলেন।

শেষে বাধ্য হইয়া ধনঞ্জয়বাবু সকলের অজ্ঞাতসারে বিবাহ করিবেন স্থির করিলেন। ঘটক খুব গোপনে গোপনে চেষ্টা করিতে লাগিল। অল্পদিন পরে ঘটক আসিয়া সংবাদ দিল, দাঁইহাটীর কৈলাস মিত্রের একটি অরক্ষণীয়া কন্যা আছে; মেয়েটি বয়ঃস্থা, সুরূপা ও সুলক্ষণযুক্তা। দোষের মধ্যে কৈলাস মিত্র সমাজচ্যুত—অলীক জনরবে তিনি বহুদিন হইতে একঘরে হইয়া রহিয়াছেন।

কৈলাস মিত্রের অবস্থা শুনিয়া ধনঞ্জয়বাবু সগর্বে বলিলেন, "হউন তিনি একঘরে! আমি তাঁর মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে আনলে আমাকে কোন কথা বলে এমন ক্ষমতা কারো নেই। মেয়েটিকে কিন্তু আমি নিজে দেখে পছন্দ করব।"

ঘটক তখন কৈলাসনাথকে সংবাদ দিয়া জানাইলেন, এবং তাঁহার নিকট ধনঞ্জয়বাবুর বিষয়-বৈভবের কথা ও তাঁহার প্রথমা স্ত্রী সত্ত্বেও দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের কারণ বিবৃত করিলেন। কন্যাদায়ে বিব্রত কৈলাসনাথ রাজী হইলেন। ঘটক সেই দিনই সন্ধ্যার পর ধনঞ্জয়বাবুকে লইয়া গিয়া মেয়ে দেখাইয়া দিবেন বলিয়া দিলেন।

সীতাপুর হইতে দাঁইহাটী বেশী দূর নহে, এক ক্রোশ পথ মাত্র। দিনমানে গেলে পাছে জানাজানি হয়, এই আশঙ্কায় ধনঞ্জয়বাবু সন্ধ্যার পূর্বে বাহির হইয়া পথে ঘটককে সঙ্গে লইয়া রাত্রে কৈলাসনাথের বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

মেয়ে পছন্দ না হইবার কোন কোনই কারণ ছিল না। চতুর্দশবর্ষীয়া কিশোরীর লজ্জারক্ত অপূর্ব মুখশ্রী, ভাসা ভাসা চোখের সঙ্কোচবিজড়িত চঞ্চল দৃষ্টি, প্রশ্নের উত্তর দানকাল আরক্ত ওষ্ঠাধরের মৃদু স্ফুরণ, ধনঞ্জয়বাবুকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া দিল। মেয়ে দেখিয়া ধনঞ্জয়বাবু কৈলাসনাথকে বলিলেন, "আপনার কোন চিন্তা নেই কৈলাসবাবু। বিবাহের খরচপত্রের ভার সমস্তই আমার। আপনি শুধু মেয়েটিকে উৎসর্গ করে দেবেন।"

কৈলাসনাথ হর্ষবিষাদকণ্ঠে ধনঞ্জয়বাবুর নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। তারপর সামান্য জলযোগ করিয়া ধনঞ্জয়বাবু ঘটকের সহিত বিদায় গ্রহণ করিলে কৈলাসনাথ যেন নিশ্চিন্ততার নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। আঃ! এতদিন পরে বুঝি ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

কিন্তু—হঠাৎ একটা 'কিন্তু' আসিয়া কৈলাসনাথের নিশ্চিন্ত চিত্তে যেন খানিকটা চিন্তার ভার চাপাইয়া দিল। তিনি তো কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হইলেন, কিন্তু কন্যার পরিণাম? ধনী হইলেও—প্রতিপত্তিশালী হইলেও ধনঞ্জয় ঘোষ তো নন্দরাণীর উপযুক্ত পাত্র নয়। এই পঞ্চাশৎ-বর্ষীয় প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ কি চতুর্দশবর্ষীয়া বালিকার উপযুক্ত স্বামী? তাহার উপর সপত্নী। হা ভগবান, নন্দরাণীর অদৃষ্টে এই ছিল!

নন্দরাণী কাছে আসিয়া ডাকিল, "বাবা।"

কৈলাস সজল দৃষ্টি উত্তোলন করিয়া কন্যার মুখের উপর স্থাপন করিলেন। পিতার মুখের ভাব দেখিয়াই নন্দরাণী বুঝিতে পারিল, তিনি ভাবিতেছেন।

জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবছ বাবা!"

কৈলাসনাথ উত্তর করিলেন, "ভাবছি—এমন কিছু ভাবি না মা।

আমার যা ভাবনা ছিল, ভগবান্ তা তো এক রকম দূর করে দিলেন। এবার তোর ভাবনা আছে যে!"

নন্দরাণী হাস্য-প্রফুল্লমুখে পিতাকে সান্তনা দিয়া বলিল, "সে যা হয় হবে, এখন উঠে এস দেখি, আমি রেঁধেবেড়ে বসে রয়েছি। রাতও দুপুর হতে যাচ্ছে।"

কৈলাসনাথ একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

॥ চৌদ্দ ॥

বৈদ্যনাথকে সম্বোধন করিয়া হালদার মহাশয় বলিলেন, "কৈলাস মিত্তিরের মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র পেয়েছ বদ্যিনাথবাবু?"

সাশ্চর্যে বৈদ্যনাথ বলিলেন, নিমন্ত্রণপত্র! কৈলাস মিত্তিরের মেয়ের বিয়ের নাকি?"

মৃদুগম্ভীর হাস্যসহকারে হালদার মহাশয় বলিলেন, "এই রকমই তো শুনতে পাচ্ছি!"

বৈদ্যনাথ। বিয়েটা হচ্ছে কোথায়?

হালদার। যে-সে জায়গা নয়! সীতাপুরের ধনঞ্জয় ঘোষকে জান?

বৈদ্যনাথ। খুব জানি। তার ছেলের সঙ্গে বিয়ে নাকি?

হালদার। তার আবার ছেলে কোথায়? সে নিজেই তো ছেলেমানুষ। বয়স মোটে পঞ্চাশের বছর খানেক বেশী!

একটু ভাবিয়া বৈদ্যনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধনঞ্জয় ঘোষ তো কায়স্থ সমাজের মাথা বললেই হয়। সে ওর মেয়েকে বিয়ে করবে! এই বুড়ো বয়সে?"

"করবে কেন, করছে। বিয়ের দিন পর্যন্ত স্থির হয়ে গিয়েছে।

"তা'হলে তো কৈলাস মিত্তির সমাজে চল্ হয়ে গেল!"

গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালন পূর্বক হালদার মলাশয় বলিলেন, "ধনঞ্জয় ঘোষ যদি ওর মেয়েকে বিয়ে করে, তা'লে ওকে আর অচল করে রাখে কে বিদ্যিনাথবাবু? তার ওপর চল্ তো এখন থেকেই হয়ে যাচ্ছে। তোমাদের ভোলনাথ ক'দিন থেকেই ওখানে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করছে!"

বৈদ্যনাথ চমকিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভোলা ওখানে খাওয়া দাওয়া করে!"

যেন একটু উপেক্ষার ভঙ্গীতে হালদার মহাশয় বলিলেন, "ছেলে-গুলোর মুখে এই রকমই তো শুনতে পাই। আমিও দু'এক দিন ভোলাকে ঐ দিক্ থেকে আসতে দেখেছি।"

ভ্রুকুটী করিয়া বৈদ্যনাথ বলিলেন, "ঐদিক্ থেকে এলেই যে ওদের বাড়ীতে খেয়েছে এমন কথা প্রমাণিত হয় না।"

হালদার মহাশয় হাসিতে হাসিতে যেন নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সহিত বলিলেন, "আরে রামঃ রামঃ! তাও কি প্রমাণ হয়? না প্রমাণের কথাই আমি বলছি? তবে দু'পাঁচটা বদ্মাইস ছেলে নাকি গাঁয়ে এই কথাটা রটিয়েছে। তা রটালেই বা বৈদ্যনাথবাবু! আমি বলছিলাম কি, রাজীববাবু ও জগন্নাথবাবুর আমলে কৈলাস মিত্তির যে রকম ছিল, এখন আর তেমনটা নেই। সে বাঁধন অনেকটা আলগা হয়ে গিয়েছে। তার উপর এই বিয়েটা হয়ে গেলে যেটুকু আছে, সেটুকুও আর থাকবে না।"

জোরে ঘাড় নাড়িয়া বৈদ্যনাথ বলিলেন, "বৈদ্যনাথ মল্লিক বেঁচে থাকতে তা হবে না হালদার মশায়, এটা আপনি স্থির জেনে রাখবেন।"

হালদার মহাশয় অতঃপর প্রসঙ্গটা এইখানে চাপা দিয়া ক্রীড়ায় মনঃসংযোগ করিলেন। বৈদ্যনাথ কিন্তু খেলায় মন দিতে পারিলেন না। বারবার দুইবার মার খাইয়া দাবা-ছক তুলিয়া রাখিলেন এবং বাড়ীতে ঢুকিয়াই উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, "বৌঠান!"

রন্ধনশালার মধ্য হইতে মহামায়া উত্তর দিলেন, "কেন ঠাকুরপো ?"

রান্নাঘরের দরজায় গিয়া দাঁড়াইয়া বৈদ্যনাথ রোষকঠিন স্বরে বলিলেন, "ভোলাকে তুমি শাসন করবে কিনা বল দেখি !"

চকিত ভাবে মহামায়া বলিলেন, "ভোলা কি করেছে ঠাকুরপো ?"

বৈদ্যনাথ বলিলেন, "হতভাগা করেছে কি জান ? কৈলাস মিত্তিরের বাড়ীতে যায় আসে, খাওয়া দাওয়াও নাকি করে !"

মাহামায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ কৈলাস মিত্তির ঠাকুরপো ? যার সঙ্গে ঠাকুরেব সেই দলাদলি বেঁধেছিল ?"

বৈদ্যনাথ বলিলেন, "হাঁ হাঁ, সেই কৈলাস মিত্তির—যে এদ্দিন একঘরে হয়ে রয়েছে ; আজও মেয়ের বিয়ে দিতে পারে নি। ভোলা গিয়ে তার ঘরে খাওয়া দাওয়া করে। হতভাগা কোথায় ?"

মহামায়া বলিলেন, "কি জানি। বোধ হয় পটলাদের বাড়ীতে গিয়েছে।"

"তা যাক্, কিন্তু তাকে বেশ করে শাসন করে দিও। ওর সব অত্যাচার সইব বৌঠান, কিন্তু যাতে মল্লিক বংশের মাথা হেট হবে, তেমন অত্যাচার আমি কখনও সইতে পারব না। তাতে তুমি রাগই কর, আর দুঃখই কর।"

জোরে ঘাড়টা একবার দোলাইয়া বৈদ্যনাথ মহামায়ার সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিলেন। মহামায়াও রাগে মনটাকে ভারী করিয়া ভোলার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। খানিক পরে ভোলা আসিয়া যখন বলিল, "ভাত দাও জ্যেঠাইমা !" তখন মহামায়া কোন উত্তর দিলেন না ; শুধু ক্রোধগম্ভীর মুখখানা তুলিয়া তাহার দিকে চাহিলেন।

তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া ভোলা যেন একটু অধীরভাবে বলিল, "শুনতে পাচ্ছ না ? ক্ষিদে পেয়েছে, ভাত দাও।"

মহামায়া বুঝিলেন ভোলার জঠরাগ্নি প্রবল বেগেই জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে ভাত বাড়িয়া দিলেন। ভোলা গিয়া খাইতে

বসিল। মহামায়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "হারে ভোলা! তুই নাকি কৈলাস মিত্তিরের বাড়ীতে গিয়ে খেয়েছিস্?"

ভোলা বলিল, কৈলাস্ মিত্তিরের? ওঃ! নন্দরাণীদের বাড়ীতে?

মহামায়া বলিলেন, নন্দরাণী আবার কে রে?

বুড়োর মেয়ে সে। কি চমৎকার মেয়ে জ্যেঠাইমা, দেখতেও যেমন, কাজকর্মেও তেমনি। তুমি যদি দেখ জ্যেঠাইমা,—

তর্জন সহকারে মহামায়া বলিলেন, "আচ্ছা আমি দেখতে চাই না, কিন্তু সেখানে কি খেয়েছিস্ বল দেখি।"

বেশ অপ্রতিভভাবে ভোলা বলিল, "সেখানে আবার কি লুচিমণ্ডা খেতে যাবো? একদিন শুধু গোটাকতক আম খেয়েছিলাম, আর পরশু নন্দরাণী ডেকে কাঁঠাল আর মুড়ি খাওয়ালে।"

সক্রোধে মহামায়া বলিলেন, "তাদের ঘরে খেলি কেন?"

ভোলা বলিল, "কেন আবার কি? নন্দরাণী জেদ ধরলে—খেতে হবে। যদি না খাই মনে করবে, আমরা গরীব বলে খেলে না। কাজেই খেতে হ'ল। তাতে কি এমন দোষ হয়েছে?"

মহামায়া বলিলেন, "আমার মাথা হয়েছে। ওরা যে একঘরে!

হ'লই বা একঘরে। কায়েত ছাড়া হাড়ি-মুচি তো নয়?"

ওরা এখন হাড়ি-মুচিরই সামিল। গাঁয়ের কোন কায়েত বামুন ওদের ঘরে খায় কি?

ভোলা হাসিয়া উঠিল; বলিল, "ওরা খাওয়ালে তবে তো খাবে! ওরা নিজেরাই খেতে পায় না, তা খাওয়াবে কি?"

মহামায়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "ক্ষ্যাপা ছেলে! খাওয়াতে পারে না বলে যে কেউ খায় না তা নয়, ওরা সমাজে অচল হয়ে আছে। সেই জন্যেই তো ঐ মেয়েটার আজও বিয়ে হয় নি।"

মাথা নাড়িয়া ভোলা উত্তর করিল, এইবার বিয়ে হবে জ্যেঠাইমা, সব ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছে। তবে বরটা নাকি বুড়ো।"

কৌতূহলের সহিত মহামায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত বুড়ো রে?"

ভোলা বলিল, "পট্‌লার জ্যেঠামশায় বললেন, মিত্তির বুড়োর বয়সী।"

মহামায়া বলিলেন, "এত বুড়ো, তা এমন বুড়ো বরের হাতে মেয়ে দিচ্ছে কি করে?"

দুঃখিতস্বরে ভোলা বলিল, "না দিয়ে কি করবে জ্যেঠাইমা! মেয়ে বড় হয়ে উঠেছে, বিয়ে না দিয়ে তো চলে না। এদিকে গাঁয়ের লোক সব শত্রু। এই বুড়ো বরের সঙ্গেই বিয়ে হবে কিনা তাই বা কে জানে! আজ তো পট্‌লার জ্যাঠামশাই বলছিলেন, এ বিয়ে কিছুতেই হতে দেবেন না, কাকাবাবুর সঙ্গে যুক্তি করে যাতে বিয়ে না হয় তাই করবেন।"

চিন্তিতভাবে মহামায়া বলিলেন, "তা করুক গে যা হয়। তোকে কিন্তু বারণ করে দিচ্ছি, তুই আর কোন দিন ওদের বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া করিস্ না।"

আহার শেষ করিয়া ভোলা উঠিয়া গেল।

॥ পনেরো ॥

সেইদিন বৈদ্যনাথ আহারে বসিলে মহামায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ ঠাকুরপো, কৈলাস মিত্তিরের অবস্থা ইদানীং নাকি খুব খারাপ হয়েছে?"

মুখ মচকাইয়া বৈদ্যনাথ বলিলেন, "ইদানীং কেন, অনেক দিন থেকেই তো অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছে। তিন দিনের আমীর তিন দিনেই ফকির হয়ে গিয়েছে।"

একটু থামিয়া মাহামায়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওর মেয়ের নাকি এক বুড়োর সঙ্গে বিয়ে হবে?"

বৈদ্যনাথ বলিলেন, 'শুনেছি তো সীতাপুরের ধনঞ্জয় ঘোষের সঙ্গে কথাবার্তা ঠিক হয়ে গিয়েছে। ধনঞ্জয় শুধু বুড়ো নয়, তার আবার প্রথম পক্ষের স্ত্রী রয়েছে।''

শুনেই মাহামায়া যেন শিহরিয়া উঠিলেন; শঙ্কিত স্বরে বলিলেন, "সর্বনাশ! একে বুড়ো, তার ওপর সতীন! তা'হলে মেয়েটাকে হাতেপায়ে বেঁধে জলে ফেলে দেওয়া হচ্ছে বল!"

নিতান্ত অ াজ্ঞার ভাবে বৈদ্যনাথ উত্তর করিলেন, "জলে ফেলাই হোক, আর ডাঙাতে ফেলাই হোক, একঘরে লোকের মেয়ের বিয়ে যে হচ্ছে, সেই যথেষ্ট।"

দুঃখ-গম্ভীর কণ্ঠে মহামায়া বলিলেন, "লোকটা কি চিরদিনই একঘরে হয়ে থাকবে?"

"এদ্দিন তো তাই রয়েছে।"

"তোমরা চেপে রেখেছে তাই রয়েছে। তোমরা মনে করলে আজই কি উদ্ধার হতে পারে না?"

বৈদ্যনাথ বলিলেন, "পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলেই উদ্ধার পাবে।"

বৈদ্যনাথের মুখের দিকে শান্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মহামায়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "দেখ ঠাকুরপো, আমার কিন্তু মনে হয়—"

"কি মনে হয় বৌঠান?"

"আমার মনে হয় কৈলাস মিত্তির এখন সকলেরই কৃপার পাত্র।"

"কিন্তু যে কৃপার পাত্র, সে তো কারো কৃপা চায় না!"

"না চাইলেও তাকে এখন ক্ষমা করা উচিত।"

একটু উপহাসের হাসি হাসিয়া বৈদ্যনাথ বলিলেন, "সেধে ক্ষমা করতে হবে নাকি?"

শান্তগম্ভীর কণ্ঠে মহামায়া বলিলেন, "দোষ কি তাতে ঠাকুরপো? যে দুর্বল, তার মাথা তো আগে হতেই নীচু হয়ে আছে। সে প্রবলের কাছে এসে মাথা নীচু করবার আগেই প্রবল যদি তার কাছে মাথা নীচু

করে, তাতে প্রবলের মাথা একটও নীচু হয় না ঠাকুরপো, বরং আরও বেশী উঁচু হয়ে ওঠে।”

হাতের রুটীখানা থালার উপর উল্টাইতে উল্টাইতে বৈদ্যনাথ নতমুখে উত্তর করিলেন, “এটা খুব উঁচুদরের কথা বৌঠান, কিন্তু এতটা মহত্ব দেখাবার মত শক্তি আমাদের মত ক্ষুদ্র মানুষের নেই।”

কুঞ্চিতমুখে মহামায়া বলিলেন, “কিন্তু মরার উপর খাঁড়ার ঘা দিলে তাতে পৌরুষ বাড়ে না—তা জেনো। তোমরা মেয়েটার উপযুক্ত মত বিয়ের রাস্তায় যে পাঁচিল তুলে রেখেছ, সেটা ভেঙ্গে দাও। এই বুড়োর সাথে সতীনের ঘরে বিয়ে হলে মেয়েটা বাঁচবে না।”

খানিক ভাবিয়া বৈদ্যনাথ গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, “রাজীব মল্লিক যে পাঁচিলের পত্তন করে গিয়েছিলেন, জগন্নাথ মল্লিক তাতে পাকা গাঁথুনি গেঁথে দিয়েছেন। সেই পাকা গাঁথুনির পাঁচিল এত সহজে আমি ভাঙ্গতে পারব না বৌঠান!”

ইহার উপর মহামায়া আর কিছু বলিতে পারিলেন না। বৈদ্যনাথ আহার শেষ করিয়া উঠিয়া গেলেন!

হরিশ সরকার প্রমুখ গ্রামের পাঁচজন আসিয়া বৈদ্যনাথকে অনুরোধ করিতে লাগিল, ধনঞ্জয় ঘোষ যদি কৈলাস মিত্তিরের মেয়েকে বিয়ে করে তা'হলে তো লোকটা উদ্ধার হয়ে গেল। সুতরাং যাতে বিয়েটা না হয়, তার জন্যে কোমর বেঁধে লাগতে হবে।”

বৈদ্যনাথ বলিলেন, “কোমর বেঁধে লাগলেও এ বিয়ে বন্ধ হবে না। কারণ, ধনঞ্জয় ঘোষ জেনেশুনেই এ কাজে হাত দিয়েছে।”

হালদার মহাশয় বলিলেন, “আমি বেশ জানি, ধনঞ্জয় ঘোষের যে রকম আগ্রহ, তাতে সে কারো কথাতেই পশ্চাৎপদ হবে না। তবে বন্ধ করবার একটা উপায় আছে।”

সকলেই আশান্বিত নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। হালদার মহাশয় বলিলেন, “ধনঞ্জয়বাবু প্রথম পক্ষকে লুকিয়ে বিয়ে করবেন। প্রথম পক্ষ কোন রকমে সংবাদটা পেলে, এ বিয়ে কক্ষণো হবে না।”

নৈরাশ্যের আকূল সমুদ্রে কূল দেখিতে পাইয়া সকলেরই মুখমণ্ডল আশা-প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। বৈদ্যনাথ কিন্তু অপ্রসন্নমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিয়ে বন্ধ হলে আমাদের কি লাভ?"

হরিশ সরকার উত্তর করিলেন, "লাভ আমাদের মর্যাদা রক্ষা।"

ধীরু ঘোষ বলিলেন, "বিয়ে হয়ে গেলে মিত্তির বুড়ো নাকি আমাদের মর্যাদার জন্য ঘরে ঘরে এক এক গাছা দড়ি আর এক-একটা কলসী পাঠিয়ে দেবে।"

যাদব ঘোষ আসনের উপর সশব্দে চপেটাঘাত করিয়া সদর্পে বলিলেন, "বিয়ে হলে তো! আমরা বেঁচে থাকতে যদি কৈলাস মিত্তিরের মেয়ের বিয়ে হয়, তা'হলে আমাদের বেঁচে থাকাই বৃথা।"

সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "নিশ্চয়!"

মৃদু-গম্ভীর হাস্যসহকারে হালদার মহাশয় বলিলেন, "দশচক্রে ভগবান্ ভূত। আমরা দশজনে যদি পিছনে লাগি, তা'হলে বিয়ে তো দূরের কথা, ঐ ধনঞ্জয়বাবুকেই উড়িয়ে দিতে পারি। দশজনে কি না করতে পারি?"

হরিশ সরকার বলিলেন, "তাই উড়িয়ে দিতে হবে দাদাঠাকুর! নইলে আমাদের মুখে লোকে চুণকালি দেবে।"

হালদার মহাশয় সহাস্যমুখে তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "ভয় নেই হে হরিশ, ভয় নেই। তোমাদের কল্যাণে আমি না পারি এমন কাজই নেই। তবে কি জান ভায়া, এ কাজে আমি প্রকাশ্যভাবে থাকতে পারব না। আমি হচ্ছি কৈলাস মিত্তিরের পুরোহিত। আমি যদি প্রকাশ্যে তার অহিত চেষ্টা করি, তা'হলে লোকে কি বলবে?"

শ্লেষতীব্র কণ্ঠে বৈদ্যনাথ বলিলেন, "লোকে বলবে, আপনি যজমানের সম্পূর্ণ হিতৈষী।"

এই শ্লেষবাক্যে একটু লজ্জা অনুভব করিয়া হালদার মহাশয় এ বিষয়ে স্বীয় নির্দোষিতা প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, "কি জান বদ্যিনাথবাবু, পুরোহিত যজমানের হিতৈষী বটে, কিন্তু যজমান যদি

পুরোহিতের হিতোপদেশ না শুনে, তা'হলে পুরোহিতের দোষ কি বল তো? ঐ বিন্দী মাগী একদিন বাজারের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আমাকে কি গালটাই না দিলে! কিন্তু কৈলাস মিত্তির কি সেই মাগীর সংস্রব ত্যাগ করল? পুরোহিত বলে কি আমার মান-অপমানও নেই?"

হালদার মহাশয়ের এ প্রশ্নের উত্তর বৈদ্যনাথ দিতে পারিলেন না। উত্তর দিলে নিতান্ত রূঢ় হইবে বলিয়াই বোধ হয় দিলেন না।

তখন সকলে মিলিয়া পরামর্শ স্থির করিল, এই বিবাহের সংবাদ ধনঞ্জয় ঘোষের প্রথম পক্ষের কর্ণগোচর করিতে হইবে, তাহা হইলেই নির্বিবাদে সকলের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিবে। ইহাতেও যদি উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, তখন অন্য উপায় অবলম্বন কয়া যাইবে।

পরামর্শ স্থির হইল বটে, বৈদ্যনাথ কিন্তু এ পরামর্শে তেমন উৎসাহ প্রদর্শন করিলেন না। মহামায়ার কথাগুলি তেমন গ্রাহ্য বলিয়া মনে না করিলেও সেই কথাগুলি তাহাকে কেমন যেন নিরুৎসাহ করিয়া দিয়াছিল।

॥ ষোলো ॥

ভোলা ইস্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া মহামায়াকে সম্বোধন করিয়া অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল, "কাল থেকে আমি আর ইস্কুলে যাব না জ্যেঠাইমা!"

একটু বিস্ময়ের সহিত মহামায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন রে?"

একটু ইতস্তত করিয়া ভারী গলায় ভোলা বলিল, "ইস্কুলে ক্লাসের কোন ছেলেই আমার সঙ্গে বসতে চায় না।"

কৌতূহলান্বিত ভাবে মহামায়া বলিলেন, "তোর সঙ্গে বসতে চায় না? কেন, তুই করেছিস্ কি?"

মাথা নীচু করিয়া রাগে গোঁ-গোঁ করিতে করিতে ভোলা বলিল,

"ওই যে নন্দরাণীদের বাড়ীতে আমি খেয়েছি। তারা বলে, আমি একঘরে হয়েছি। আমাকে নাকি মাথা মুড়িয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।"

মহামায়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "এই জন্মে তারা তোর সঙ্গে বসতে চায় না।"

তুঃখ-পরিম্লান মুখে ভোলা বলিল, শুধু বসতে চায় না নয়। আমাকে আজ যেন ক্ষেপিয়ে তুলেছে। কাল থেকে আমি কক্ষণো ইস্কুলে যাব না।"

একটু ভাবিয়া মহামায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই নন্দরাণীদের বাড়ীতে খেয়েছিস্, তোকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, ছেলেরা এসব কথা জানলে কি করে রে?"

"নরেশ তাদের বলেছে।"

"কে বলেছে? নরেশ?"

"হঁা।"

"নরেশ একরত্তি ছেলে, সে এসব কথার কি জানে?"

"সে-ই কিন্তু ইস্কুলে গিয়ে সকলকে বলে দিয়েছে।"

মহামায়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, "নরেশ।"

নরেশ ইস্কুল হইতে ফিরিয়া জলযোগান্তে ঘুড়ি-নাটাই লইয়া বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেছিল, মহামায়ার ডাক শুনিয়া উত্তর দিল, "কেন জ্যেঠাইমা!"

গম্ভীর কণ্ঠে মহামায়া আদেশ করিলেন, "এদিকে আয়!"

আদেশের স্বরেই জ্যেঠাইমার রাগ বুঝিতে পারিয়া নরেশ ঘুড়ি-নাটাই রাখিয়া ভয়ে ভয়ে মহামায়ার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

মহামায়া তাহার মুখের উপর ক্রুদ্ধদৃষ্টি স্থাপন করিয়া তর্জন সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তুই ইস্কুলে গিয়ে ছেলেদের সব কি বলেছিস্?"

ভীতিজড়িত স্বরে নরেশ উত্তর দিল, "কিছুই তো বলি নি জ্যেঠাইমা!"

ধমক দিয়া ভোলা বলিল, "কিছুই বলিস্ নি মিথ্যুক¿ আমি নন্দরাণীদের বাড়ীতে খেয়েছি, আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে—"

মহামায়া বলিলেন, "এই সব কথা বলেছিস্ তুই?"

নরেশ কাঁদ-কাঁদ মুখে নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। মহামায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত কথা তোকে কে বললে বল্ তো?

ছলছল চোখে নরেশ উত্তর দিল, "মা।"

মহামায়া ধমক দিয়া বলিলেন, "হাঁ, মা তোকে এই সকল কথাই ইস্কুলে বলতে বলেছে!"

দুই হাতে চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে নরেশ বলিল, "আমি সত্যি বলছি জ্যেঠাইমা, মা ইস্কুলে বলতে শিখিয়ে দিয়েছে।"

দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া, সক্রোধকণ্ঠে ভোলা বলিল, "আবার মিথ্যে কথা! কাকীমা তোকে শিখিয়ে দিয়েছে, না তুই নিজেই বলেছিস্?"

ভোলা গিয়া নরেশের একটা কান টানিয়া ধরিলে নরেশ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে আমোদিনী ক্রুদ্ধা ব্যাঘ্রীর ন্যায় ছুটিয়া আসিলেন; গর্জন করিয়া বলিলেন, "তা ও' নিজে বলবে কেন, আমিই বলে দিয়েছি ইস্কুলের সবাইকে বলতে! তাতে আমায় কে কি করবে বল্ তো?"

ভোলা নরেশের কান ছাড়িয়া দিয়া হতবুদ্ধির ন্যায় কাকীমার মুখের দিকে চাহিল। মহামায়া সবিস্ময়ে আমোদিনীর ক্রোধোদ্দীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলিস্ কি ছোটবৌ! তুই শিখিয়ে দিয়েছিস্?"

সতেজকণ্ঠে আমোদিনী বলিলেন, "হাঁ শিখিয়ে দিয়েছি, তাতে হয়েছে কি? কেউ আমার মাথাটা কেটে নেবে?"

দুঃখিতভাবে মহামায়া বলিলেন, "মাথা কেউ কারো কাটবে না ছোটবৌ, কিন্তু তুই দেখছি এই রকমে ছেলেটার মাথা খাবি।"

আহতা ভুজঙ্গীর ন্যায় আমোদিনী গর্জিয়া উঠিলেন। চিৎকার করিয়া বলিলেন, "কি আমি ছেলের মাথা খাব? বালাই ষাট্! তুমি তোমার আদুরে গোপালের মাথা খাও।"

মহামায়া মাথা খাওয়া অর্থে ছেলেকে অধঃপাতে দিবার কথাই বলিয়াছিলেন। কিন্তু আমোদিনী যখন কথাটাকে অন্য ভাবে ধরিয়া লইয়া তীব্র কটূক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, তখন মহামায়াও ধৈর্য রক্ষা করিতে পারিলেন না; তিনিও রাগে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "দেখ্ ছোটবৌ, মুখ সাম্‌লে কথা কইবি।"

আমোদিনী অধিকতর উত্তেজিতভাবে বলিলেন, "আমি মুখ সাম্‌লে কথা কইতে যাব কেন বল তো? আমি তোমার খাই, না পারি? আমার সোয়ামীর রোজগার খেয়ে আমাকে এত বড় কথা বলতে তোমার লজ্জা হয় না?"

রাগে মহামায় পা হইতে মাথা পর্যন্ত যেন থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি ক্রোধবিকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "আচ্ছা আসুক আজ ঠাকুরপো ঘরে, আমি তার রোজগারে খাচ্ছি কিনা জিজ্ঞাসা করব।"

আমোদিনী বলিলেন, "স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করতে পার। ঘরে এলে আমিও আজ এর একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়ব না।"

মহামায়া বলিলেন, হেস্তনেস্ত কি করবি ছোটবৌ, আলাদা হবি তো? তোকে আলাদা হতে হবে না, আমিই আলাদা হ'ব!

রাত্রিতে আহারে বসিয়া বৈদ্যনাথ মহামায়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি নাকি আলাদা হতে চাইছ বৌঠান?'

"হাঁ, কালই আমাকে আলাদা করে দাও ঠাকুরপো!"

"কালই?"

"হাঁ।"

"এত তাড়াতাড়ি কেন?"

"আমি আর একদিনও তোমাদের একান্নে থাকতে চাই না।"

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বৈদ্যনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুধু

হাড়ি আলাদা হবে না জমি-জায়গা পর্যন্ত ?"

মহামায়া বলিলেন, "জমিজায়গা, ধানচাল, ঘটীবাটি—যা কিছু আছে, সব আলাদা করে দিতে হবে।"

কিৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া বৈদ্যনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু হঠাৎ এরকম আলাদা হতে চাইছো বৌঠান ?"

"অন্যদিকে মুখ রাখিয়া মহামায়া উত্তর করিলেন, "এক সংসারে থেকে আমি আর এত খাটতে পারব না !"

খাটতে না পার, আমি আলাদা ঝি-রাঁধুনি রেখে দিচ্ছি।"

"তোমার সংসার আলাদা করে নিয়ে তুমি স্বচ্ছন্দে এসব রাখতে পার, আমি কিন্তু আর এক সংসারে থাকব না।"

বৈদ্যনাথ আর কিছু বলা প্রয়োজন বোধ করিলেন না।

।। সতেরো ।।

বিন্দী বলিল, "হ্যারে কর্তাবাবু, নন্দর তরে নাকি একটা বুড়ো বর নিয়ে আসবে ?"

ম্লানহাস্যে কৈলাসনাথ বলিলেন, "বুড়োর কত পয়সা তা জানিস্ !

তাচ্ছিল্যসূচক ভ্রূভঙ্গী করিয়া বিন্দী বলিল, "আরে মোর পয়সা ! পয়সা আমি ঢের দেখেছি।"

বিষাদ-গম্ভীর মুখে কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বিন্দী পুনরায় সদুঃখে বলিল, "শুধু বুড়ো বর হলেও তো কথা ছিল না কর্তাবাবু, আবার সতীন-কাঁটাও নাকি রয়েছে।"

একটু বিষাদের হাসি হাসিয়া কৈলাসনাথ বলিলেন, "সে কাঁটায় ভয় নেই বিন্দী ! ধনঞ্জয়বাবু বলেছে, তাকে আমার নন্দরাণীর দাসী করে রাখবে।"

বিন্দী বলিল, "দাসী হোক, বাঁদী হোক, সতীন তো বটে ! না কর্তাবাবু, তুমি জেনে শুনে মেয়েটাকে জলে ফেলে দিচ্ছ।"

কৈলাসনাথ বলিলেন, "কি করব বিন্দী, উপায় যে নেই।"

কৈলাসনাথ একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

উপায় যে নেই, বিন্দীও তাহা জানিত। সুতরাং সে নিঃশব্দে নতমুখে বসিয়া রহিল।

কৈলাসনাথ বলিলেন, "নন্দরাণী অনেক্ষণ জল আনতে গিয়েছে, এখনও ফিরল না কেন?"

সচকিত বিন্দী বলিল, "সত্যই তো! আমি আসবার আগে গিয়েছে সে, দেখব নাকি?"

কৈলাসনাথ বলিলেন, "জল আনতে তার এত দেরী তো হয় না"

মুখ মচকাইয়া বিন্দী বলিল, "ঘাটে হয়তো কেউ এসে জুটেছে, তার সাথে গল্প করতে লেগেছে। যাই ডেকে আনি।"

বিন্দী বাহির হইয়া গেল। কৈলাসনাথ উৎকণ্ঠিতভাবে বাহিরে গিয়া বসিলেন।

জল আনিতে গিয়া নন্দরাণী বড়ই বিপদে পড়িয়াছিল। সে প্রায়ই খুব বেলা থাকিতে—ঘাটে অপর কেহ আসিবার আগেই জল আনিতে যাইত। যেদিন বিলম্ব হইত, ঘাটে পাড়ার অপর স্ত্রীলোকের দল আসিয়া জুটিত, সেদিন নন্দরাণী বিপন্ন হইয়া পড়িত; তাহার বিবাহের কথা, তাহার পিতার দুরবস্থার কথা লইয়া সকলে এমন সমবেদনাসূচক মন্তব্য প্রকাশ করিত, যাহা নন্দরাণীর নিকট তীব্র উপহাস বলিয়া বোধ হইত। সে কোনরূপে জল লইয়া পলাইয়া আসিয়া তাহাদের সহানুভূতিপূর্ণ উপহাসের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিত। এজন্য যেদিন একটু বেলায় যাইত, সেদিন আর সে জল আনিতে যাইত না!

সেদিন কিন্তু খুব বেলা থাকিতে নন্দরাণী জল আনিতে গিয়াছিল। ঘাটে তখন জনপ্রাণীর সমাগম হয় নাই। শুধু পাড়ের উপর তালগাছগুলি রৌদ্রদগ্ধ আকাশে মাথা তুলিয়া নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। তালপুকুরের বিস্তৃত জলরাশি দীপ্ত সূর্য্য কিরণ সম্পাতে রূপার মত চক্‌চক্ করিতে ছিল।

ঘাটে কেহ নাই দেখিয়া নন্দরাণী নিশ্চিন্তচিত্তে জলে নামিল, এবং কলসীটা জলে ভাসাইয়া দিয়া কোমরজলে গা ডুবাইয়া বসিল। ঘাটের

ধারে একটা বড় আমগাছ ঘন শাখাপল্লব প্রসারণে ঘাটের কতকটা স্থান ছায়াময় করিয়া তুলিয়াছিল। সেই ছায়াময় স্থানে স্বচ্ছ শীতল জলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া নন্দরাণী রৌদ্রতপ্ত দেহ শীতল করিতে লাগিল। ছোট ছোট ঢেউগুলি আসিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিতে লাগিল। নন্দরাণী মধ্যে মধ্যে মুখমধ্যস্থ জল সূর্যাভিমুখে বিক্ষিত কবিয়া জলকণার মধ্যে রামধনুর বর্ণ-বৈচিত্র্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এদিকে কলসীটা যে তরঙ্গ-তাড়নে নাচিয়া নাচিয়া গভীর জলের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, সেদিকে তাহার লক্ষ্য রহিল না।

যখন লক্ষ্য হইল, কলসী তখন সাঁতার-জলে চলিয়া গিয়াছে। দেখিযা নন্দরাণীর মুখ শুকাইয়া গেল। সর্বনাশ, ইহার মধ্যে কলসীটা এত দূরে ভাসিয়া গিয়াছে! এখন কলসী ধরিবার উপায় কি? একটা লম্বা বাঁশ কি কঞ্চি পাইলেও ধরিতে পারিত। কিন্তু সে রকম বাঁশ বা কঞ্চি এখানে কোথায়? ঘাটও এমন কেহ নাই, যাহার নিকট সে সাহায্য ভিক্ষা করে। নন্দরাণী কলসী ধরিবার উপায় কিছু খুঁজিয়া পাইল না; শুধু কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাবে ভাসমান কলসীর দিকে ভাসিযা চলিল।

কোন উপায় না দেখিয়া নন্দরাণী অবশেষে পাড়ের উপর উঠিল এবং ব্যাকুল দৃষ্টিতে ইতস্তত নিরক্ষণ করিতে করিতে অদূরে একটা লম্বা কঞ্চি দেখিতে পাইল। তখন হৃষ্টচিত্তে কঞ্চিটা কুড়াইয়া লইয়া পুনরায় জলে নামিল, এবং গলা পর্যন্ত জলে গিয়া কঞ্চি বাড়াইয়া কলসীটা ধরিবার জন্যে চেষ্টিত হইল। আর একটু—আর একটু,—কঞ্চি আগা কলসীর গায়ে ঠেকিয়াছে, আর একটু বাড়াইতে পারিলেই টানিয়া আনা যায়। নন্দরাণী আরও একটু অগ্রসর হইল। আর এক পা—চিবুক পর্যন্ত ডুবাইয়া পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের উপর ভর দিয়া সে কঞ্চিটা বাড়াইয়া দিল। কিন্তু ঝোঁক সামলাইতে পারিল না, প্রায় উপুড় হইয়া কঞ্চিটা বাড়াইতে যাইতেই সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া গেল। নন্দরাণী সাঁতার জানিত না, সুতরাং পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই

ডুবিয়া গেল, এবং পরক্ষণেই ভাসিয়া উঠিয়া তীরের দিকে আসিবার জন্যে চেষ্টিত হইল। কিন্তু সেখানে মাটিতে পা পাইল না; সুতরাং সে একবার ডুবিয়া, একবার ভাসিয়া তীরের দিকে যাইবার উদ্দেশ্যে প্রাণপনে চেষ্টা করিতে করিতে সবেগে হাত-পা ছুঁড়িয়া ক্রমেই গভীর জলের দিকে যাইতে লাগিল। হরিশ সরকার পুকুরের পশ্চিম পাড়ে ছিপ ফেলিয়াছিলেন। নন্দরাণীর অবস্থা দেখিয়া তিনি নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া যেন খুব একটা কৌতুকজনক ব্যাপারের ন্যায় এই মজ্জমান বালিকার ব্যর্থ প্রয়াস নিরক্ষণ করিতে লাগিলেন।

ঠিক সেই সময় ইস্কুলের ছেলেরা ছুটির পরে হর্ষকলরোলে নির্জন পল্লীপথ প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। পুকুরের পাড়ের উপর দিয়াই রাস্তা। পাড়ে উঠিতেই ছেলেদের দৃষ্টি মজ্জমান বালিকার উপর নিপতিত হইল; এবং দেখিবামাত্র সকলে ভীতিসূচক চিৎকার করিয়া উঠিল। ছেলেদের মধ্যে ভোলা, পটলা, কেলো প্রভৃতি ছিল। ভোলা মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া, বই-খাতা মাটিতে রাখিয়া গায়ের জামাটা টানিয়া খুলিয়া ফেলিল, এবং কেঁচোর কাপড়টা সত্বর গুছাইয়া লইয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পটলাও জলে নামিল।

নন্দরাণী তখনও ডুবিয়া যায় নাই; হাতপা ছুঁড়িয়া আসন্ন মৃত্যুর সঙ্গে প্রাণপনে যুদ্ধ করিতেছিল। ভোলা সাঁতার দিয়া আগাইয়া, হাত বাড়াইয়া তাহার চুলের মুঠা ধরিল এবং পটলা তাহার পরিধেয়ের প্রান্ত ছুঁড়িয়া দিলে তাহা ধরিয়া ধীরে ধীরে ঘাটের দিকে অগ্রসর হইল। মাটিতে পা ঠেকিলে উভয়ে ধরিয়া নন্দরাণীকে ঘাটের উপর তুলিল। ছেলের দল করতালি দিয়া সোল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহাদের কলরবে আরও অনেক লোক তথায় আসিয়া সমবেত হইল।

নন্দরাণী তখন জল খাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল! কৌশলে তাহার পেটের জল বাহির করিয়া সকলে মিলিয়া তাহার চৈতন্য সঞ্চারের চেষ্টা করিতে লাগিল। এই সঙ্গে তাহার এরূপে জলমগ্ন হইবার কারণ

নির্ণয় করিবার জন্য অনেকে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। কেহ বলিল, সাঁতার দিতে গিয়া ডুবিয়া গিয়াছিল। কেহ বলিল, নন্দরাণির মত শান্তশিষ্ট মেয়েটির সাঁতার দিতে যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব, বোধ হয় কলসী ধরিতে গিয়া ডুবিয়াছে; কেহ বা মত প্রকাশ করিল, মনের দুঃখে হয়তো আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিল।

কিছুক্ষণ শুশ্রূষার পর নন্দরাণী অনেকটা সুস্থ হইলে সকতে ধরাধরি করিয়া তাহাকে বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিতে উদ্যোগী হইল। কিন্তু তাহার আর প্রয়োজন হইল না; বিন্দী পথিমধ্যেই বিপদ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তথায় উপস্থিত হইল, এবং ভোলা-প্রমুখ কয়েকজন বালকের সহায়তায় নন্দরাণীকে ঘরে লইয়া আসিল। আসিয়া কৈলাসনাথের নিকট নন্দরাণীর আত্মহত্যার বিবরণ কীর্তনপূর্বক তাঁহার বিবেচনা-শক্তির যথেষ্ট দোষ দিতে লাগিল। কৈলাসনাথ নীরবেই তাহার তিরস্কার সহ্য করিতে বাধ্য হইলেন।

আকাশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিদ্যুতের স্ফুরণ হইতে যতটা বিলম্ব হয়, তদপেক্ষাও স্বল্পসময় মধ্যে এই কথাটা গ্রামের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং স্ত্রী-পুরুষ যে ইহা শুনিল, সে-ই ছুটিয়া আসিল। মেয়েটাকে দেখিয়া বলাবলি করিতে লাগিল—সর্বনাশ, এই একরত্তি মেয়ের পেটে পেটে এত বুদ্ধি! হইলই বা বুড়ো বর; বুড়ো বর হইবে বলিয়া সেই ভয়ে কবে কোন মেয়ে এভাবে জলে ডুবিয়া মরে? ছিঃ ছিঃ মেয়েটা কি ঠ্যাটা!

একে তো আত্মহত্যার অকারণ কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়া নন্দরাণী নিতান্ত লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর পাঁচজনের এইরূপ তীব্র সমালোচনাগুলি যখন তাহার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল, এবং তখন সত্যই তাহার জলে ডুবিয়া মরবার জন্য ইচ্ছা হইতে লাগিল, এবং জলে ডুবিয়াও যে তাহার মরণ হইল না, পুনরায় বাঁচিয়া উঠিল। ইহা তাহার নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলিয়াই সে বিবেচনা করিয়া লইল।

নন্দরাণী বেশ সুস্থ হইয়া উঠিলে কৈলাসনাথ সকরুণ নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বেদনাজড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "আমাকে ক্ষমা কর নন্দ, আমি তোর নিতান্ত অক্ষম পিতা!"

নন্দরাণী পিতার কাতরতা দর্শনে ব্যস্ততার সহিত তাঁহার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুপ্লাবিত কণ্ঠে বলিল, "তোমার পা ছুঁয়ে বলছি বাবা কলসী ধরতে গিয়েই আমি ডুবে গিয়েছিলাম।"

মেয়ের মাথার উপর হাতখানা রাখিয়া গভীর বিষাদপূর্ণ স্বরে কৈলাসনাথ বলিলেন, আত্মহত্যার চেষ্টায় তুই ডুবে গেলেও আমি একটুও আশ্চর্য হতাম না নন্দ। কেন না আমি বাপ হয়ে যখন তোর জীয়ন্তে মৃত্যুর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি—"

অশ্রুভারে পিতার কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। নন্দরাণী সবেগে মাথা তুলিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে দৃঢ় সতেজ কণ্ঠে বলিল, "আমি তা কক্ষনো মনে করিনি বাবা! তুমি আমার জন্য যা করছ, তাকে আমি পরম মঙ্গল বলেই গ্রহণ করে নিতে পারব। তা যদি না পারি তবে আমি তোমার মেয়েই নই।"

কৈলাসনাথ অশ্রুরুদ্ধ দৃষ্টিতে কন্যার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা-সমুজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া, দুঃখ-দৈন্য-বেদনা—সকল বিস্মৃত হইয়া সস্নেহে তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিলেন।

॥ আঠারো ॥

ভোলা ভিজা কাপড়ে বাড়ী পৌঁছিয়া মহামায়ার নিকট নন্দরাণীর বিবরণ কীর্তন করিলে মহামায়া শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, "বলিস্ কিরে ভোলা, এতদূর হয়েছে!"

ভোলা বলিল, হয়েছে বৈ কি জ্যেঠাইমা! আমাদের আসতে আর একটু দেরী হলে কি হ'ত বলা যায় না।"

মহামায়া বলিলেন, "ভগবানই রক্ষা করেছেন। আহা, মেয়েটার ভালমন্দ হলে বুড়ো কি আর বাঁচত!"

বিরক্তিকুঞ্চিত মুখে ভোলা বলিল, "বুড়ো না বাঁচলে তো বয়েই গেল! কিন্তু মেয়েটা তো মারা যেত।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া মহামায়া সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "আহা, বড় দুঃখেই মেয়েটা মরতে গিয়েছিল ভোলা! ওর মত দুঃখী মেয়ে আর নেই বললেই হয়।"

জোরে মাথা নাড়িয়া গম্ভীরমুখে ভোলা বলিল, "ওর কি এত দুঃখটা শুনি, যার জন্যে জলে ডুবে মরতে যায়!"

ম্লানহাস্য সহকারে মহামায়া বলিলেন, "ওর দুঃখ তুই কি বুঝবি ভোলা! যদি মেয়েছেলে হতিস তা'হলে বুঝতে পারতিস্।"

ভোলা বলিল, "বেশ তো, তুমি আমাকে বুঝিয়ে দাও না।"

মহামায়া বলিলেন, "এর আর বোঝাবার কি আছে বল। চৌদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ে হয়েছে, বাপ বিয়ে দিতে পারছে না। এতে বাপ কি যাতনা ভোগ করছে, মেয়ে কি তা জানতে পারছে না?"

ভোলা বলিল, পারছে বৈ কি!

মহামায়া বলিলেন, তারপর বহু কষ্টে যদিও বিয়ের জোগাড় হ'ল, তাও বুড়ো বর, তার উপর সতীন। মেয়েমানুষের পক্ষে সতীন-কাঁটা যে কি রকম বিষম কাঁটা, তা মেয়েমানুষ ছাড়া অপরে তা বুঝবে না।

ভোলা সবিস্ময়ে বলিল, তা'হলে এই দুঃখেই জলে ডুবে মরতে গিয়েছিল বল!

মহামায়া বলিলেন, তা নয় তো শুধু শুধু কি কেউ মরতে যায় রে!

ভোলা আর কিছু না বলিয়া কাপড় ছাড়িতে গেল। কাপড় ছাড়িয়া আসিয়া খাইতে বসিয়া মহামায়াকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আচ্ছা, জ্যেঠাইমা!"

"কেন রে ভোলা!"

"ঐ বুড়ো ছাড়া দেশে কি আর বর নেই?"

"বর থাকবে না কেন? কিন্তু একঘরে লোকের মেয়েকে কে বিয়ে করবে?"

ভ্রুকুটি করিয়া ভোলা বলিল, "আরে রেখে দাও একঘরে। একঘরে বলেই কেউ ওকে বিয়ে করবে না?"

"বিয়ে করে কে একঘরে হবে বল্? সে সাহস কার আছে?"

"কারও নেই?"

"থাকলে এত দিন কবে ওর বিয়ে হয়ে যেত।"

"আমি কিন্তু সে সাহস করতে পারি জ্যেঠাইমা!"

সহাস্যে মহামায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পারিস্?"

মাথা নাড়িয়া ভোলা উত্তর করিল, "খুব পারি, তুমি যদি বল।"

মহামায়া হাসিয়া উঠিলেন, "আমি কি করে বলব রে? আমি কি তোকে সমাজের বাইরে যেতে বলতে পারি? তা যাক্‌গে, বাদ দে ওসব কথা। এখন এক কাজ কর দেখি, একবার হালদার মশায়কে ডেকে নিয়ে আয়।"

ভোলা জিজ্ঞাসা করিল, "হালদার মশায়কে ডেকে কি হবে?

মহামায়া বলিলেন, "আমার দরকার আছে। আজ ঠাকুরপো ছোটবৌকে আলাদা হাঁড়ি করতে বলে গিয়েছে।"

ভোলা বলিল, "তা করলেই বা আলাদা হাঁড়ি! তোমার হাঁড়ি তো আলাদা হয়েই রয়েছে।"

হাসিতে হাসিতে মহামায়া বলিলেন, "নাঃ, এত বড় ছেলে হলি, তোর জ্ঞানবুদ্ধি যদি একটুও হ'ল! তোকে এখন যা বলছি তাই কর। ঠাকুরপো তো না খেয়েই বেরিয়ে গিয়েছে। এখন হালদার মশায়কে দিয়ে তাকে যদি শান্ত করতে পারি।"

ভোলা স্বীকৃত হইয়া হালদার মশায়কে ডাকিতে চলিল।

মহামায়া খুব রাগের মাথাতেই আলাদা হইবার কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু সেই কথায় বৈদ্যনাথ যে সত্যসত্যই আলাদা হইয়া পড়িবেন, এতটা তখন ভাবিয়া দেখেন নাই। কিন্তু দিন দুই পরে বৈদ্যনাথ হঠাৎ

যখন তাঁহাকে বলিলেন, 'তা হলে কাল দিন ভাল আছে বৌঠান, কাল থেকেই হাঁড়ি আলাদা হোক। তারপর জমি-জায়গার ভাগ দিন কতক পরে হলে চলবে।' তখন মহামায়ার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। লজ্জায় তিনি কোন উত্তর দিতে পারিলেন না।

প্রত্যহ যেমন বৈদ্যনাথের অফিসের ভাত প্রস্তুত করিয়া দেন, সেদিন সকালে তেমনি প্রস্তুত করিয়া বৈদ্যনাথকে খাইতে ডাকিলে বৈদ্যনাথ উত্তর দিলেন, "আজ তো তোমার হাঁড়িতে খাবার কথা নয় বৌঠান, আজ থেকে যে আমাদের আলাদা হাঁড়ি।"

মহামায়া বলিলেন, "তোমাদের আলাদা হাঁড়ি যে এখনো উনানে চড়েনি। যখন চড়বে, তখন আমার হাঁড়িতে না-ই বা খাবে।"

বৈদ্যনাথ বলিলেন, "আমাদের হাঁড়িও এক্ষুনি উনুনে চড়বে।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই আমোদিনী সত্য সত্যই একটা নূতন হাঁড়ি উনানে চাপাইলেন। কিন্তু সে হাঁড়ি উনান হইতে নামিবার পূর্বেই বৈদ্যনাথ অফিসের কাপড়চোপড় পরিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছেন দেখিয়া মহামায়া সম্মুখে গিয়া বলিলেন, "না খেয়েই বেরিয়ে যাচ্ছ যে! আলাদা হাঁড়ির ভাত খেয়ে গেলে না?"

বৈদ্যনাথ উত্তর করিলেন, "ও বেলা এসে খাবো।"

মহামায়া বলিলেন, "তা'হলে এ বেলা না হয়, আমার পুরানো হাঁড়ির ভাতই খেয়ে যাও না!"

তাঁহার দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কর্কশকণ্ঠে বৈদ্যনাথ বলিলেনা, "তোমার হাঁড়ির ভাত খাই বলে তোমার বড়ই স্পর্ধা হয়েছে বৌঠান, নইলে কক্ষনো তুমি আমাকে আলাদা হতে বলতে পারতে না। আমারও প্রতিজ্ঞা, সাতদিন সাত রাত উপোস দেব, তব তোমার হাঁড়ির ভাত আমি খাচ্ছি না।"

বৈদ্যনাথ দ্রুতপদবিক্ষেপে বাহির হইয়া গেলেন। মহামায়া লজ্জানত মস্তকে নিস্পন্দনভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমোদিনী রন্ধনশালা

হইতে তাঁহার দিকে একটা বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় রন্ধনকার্যে মনোনিবেশ কবিলেন।

মহামায়া ভোলাকে খাওয়াইয়া ইস্কুলে পাঠাইয়া দিলেন। তারপর পূজা-আহ্নিক সারিয়া দত্তদের নূতন বৌ দেখিবার আছিলায় বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িলেন। আমোদিনী যে আলাদা রাঁধিয়া আলাদা খাইবে ইহা প্রত্যক্ষ করা তাঁহার যেন অসহ্য বোধ হইল।

কিন্তু বাহিরে গিয়াও নিস্তার নাই। দত্তদের বাড়ীতে উপস্থিত হইবামাত্র দত্তগিন্নী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ গো বড় বৌমা, বদ্যিনাথ নাকি তোমাকে আলাদা করে দিয়েছে?"

মহামায়া একটু ভাবিয়া লজ্জিতভাবে বলিলেন, "ঠাকুরপো আমাকে আলাদা করে দেবে কেন? আমি আর পেরে উঠি না বলে ছোটবৌকে আলাদা রাঁধবার কথা বলে দিয়েছি।"

একটু অবিশ্বাসের স্বরে দত্তগিন্নী বলিলেন, "তবে যে ছোট বৌমা নাইতে গিয়ে আমাদের কাছে বললে, আজ থেকে তোমাদের হাঁড়ি আলাদা হয়েছে!"

আঃ! আবাগী ইহারই মধ্যে পাড়ায় সমস্ত রাষ্ট্র করিয়া দিয়াছে! বিরক্তিতে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মহামায়া উত্তর করিলেন, "সে এখনো ছেলেমানুষ, ভিতরের খবর কিছুই জানে না; তাই এমন কথা বলেছে।"

দত্তগিন্নী যেন ইহাতে যথেষ্ট আশ্বস্ত হইয়া হাস্যমুখে বলিলেন, "আমারাও তো তাই বলি, বদ্যিনাথ কি তোমার সঙ্গে আলাদা হতে পারে? তবে ছোট বৌয়ের যে রকম মুখের দৌড়, তাতে এরকম হওয়া বিচিত্র নয়। তুমি যাই বল বাছা, তোমাদের ছোট বৌটি কিন্তু কক্ষনো ভাল ঘরেরর মেয়ে নয়!"

ছোট বৌয়ের নিন্দাটা মিষ্ট না লাগিলেও মহামায়াকে নিঃশব্দেই শুনিতে হইল। কিন্তু তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না; ঘরের কাজের অছিলায় সেখান হইতে পলাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

আমোদিনী তখন আহারে বসিয়াছিলেন। মহামায়া বাড়ী ঢুকিয়াই উগ্রভাবে তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, হ্যাঁ লা ছোটবৌ!"

আমোদিনী উত্তর দিলেন, "কেন দিদি?"

মহামায়া বলিলেন, "আলাদা হাঁড়ির ভাত বড্ড মিষ্টি, না?"

আমোদিনী উত্তর করিলেন, "মিষ্টি কি তেতো, নিজে খেয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে দিদি!"

গর্জন করিয়া মহামায়া বলিলেন, "আমি অমন ভাত খেতেও চাই না, বুঝতেও চাই না। তোর মিষ্টি লাগে, তুই পেট ভরে খা। আচ্ছা ছোটবৌ, তোর কি দু'দিন তর সইল না, এর মধ্যেই পাড়ায় পাড়ায় ঘরের কেলেঙ্কারি রটিয়ে এসেছিস্?"

যেন নিতান্ত নির্দোষের মত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া আমোদিনী বলিলেন, আমি আবার পাড়ায় কি রটিয়েছি গো?"

"আলাদা হয়েছিস্ এই কথাটা। এটা খুব গৌরবের, না?"

"গৌরবের কথাই হোক, আর নিন্দার কথাই হোক, সত্যি যা তাই বলেছি, তাতে এমন কি হয়েছে?"

রোষক্ষুব্ধকণ্ঠে মহামায়া বলিলেন, "দোষ কিছু হয় নি গো, কিছু দোষ হয় নি, রটিয়ে খুব ভাল কাজই করেছ।"

শ্লেষতীব্রস্বরে আমোদিনী বলিলেন, "মন্দই যদি, তবে আলাদা হতে চেয়েছিলে কেন দিদি?"

হাত দুইটা জোড় করিয়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে মহামায়া বলিলেন, "ঝক্‌মারি করেছি গো, ঝক্‌মারি করেছি। যেমন বলেছি, তেমন উপযুক্ত সাজা আমাকে দিয়েছিস্ ছোটবৌ!"

বলিতে বলিতে মহামায়া কাঁদিয়া উঠিলেন, এবং কাঁদিতে কাঁদিতেই নিজের ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

আমোদিনী নিতান্ত অবজ্ঞা ভাবে মুখখানাকে একবার কুঞ্চিত করিয়া পুনরায় আহারে মনোনিবেশ করিলেন।

।। উনিশ ।।

হালদার মহাশয় পুরোহিত। পুরোহিতের সর্বত্র অবারিত দ্বার। সুতরাং তিনি বাড়ীর ভিতর গিয়া মহামায়া সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মহামায়া তাঁহাকে বৈদ্যনাথকে শান্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

শুনিয়া হালদার মহাশয় বলিলেন, "বৈদ্যনাথবাবুর যে রকম গোঁ, তাতে আমার কথা রাখবে কি?"

মহামায়া বলিলেন, "যদি না রাখে, তবে বলবেন, শুধু হাঁড়ি আলাদা করে দিলে চলবে না, বিষয়-সম্পত্তি, জমি-জায়গা যা কিছু আছে, সব তন্ন-তন্ন করে ভাগ করে দিতে হবে। আমি সে সব বেচে এখান থেকে চলে যাব।"

"কোথায় যাবে?"

"কাশী-বৃন্দাবন, যেখানে হয়।"

হালদার মহাশয় একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "কিন্তু মা, একটা কথা বলব, রাগ করবে না তো?"

মহামায়া বলিলেন, "না, বলুন।"

হালদার মহাশয় বলিলেন, সম্পত্তি যা আছে, তার উপস্বত্ব তুমি ভোগ করিতে পার, দান-বিক্রয়ে তোমার অধিকার নেই।"

মহামায়া বলিলেন, "ঠাকুরপো যদি সে কথা বলে, তা'হলে আমি সম্পত্তির এক কড়া ভাগও চাই না। আমি এক-কাপড়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাব।"

অপ্রতিভভাবে হালদার মহাশয় বলিলেন, "বৈদ্যনাথবাবু সে কথা বলবে কিনা জানি না; তবে আমি যা বললাম, এটা আইনের কথা। ভাল, আমি তাকে বোঝাবার চেষ্টা করব।"

সন্ধ্যার পরে বৈদ্যনাথ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'শুনলাম তুমি নাকি বিষ-সম্পত্তি সব বেচে এখান থেকে চলে যাবে বৌঠান?"

মহামায়া নিজের ঘরের বারান্দায় বসিয়া মালা জপ করিতেছিলেন ; জপ বন্ধ রাখিয়া বলিলেন, "আমি তো তাই মনে করেছিলাম। কিন্তু শুনছি, আমার নাকি সম্পত্তি দান-বিক্রয়ে অধিকার নেই।"

বৈদ্যনাথ বলিলেন, "আইনে তোমার অধিকার না থাকলেও আমি কিন্তু তোমাকে সে অধিকার দিতে পারি।"

মহা। তোমার সঙ্গে।

বৈদ্য। হাঁ, বল তো খদ্দের এনে কালই বিক্রী করে দিতে পারি।

মহা। কাল কি রকমে বিক্রীর বন্দোবস্ত হবে? সম্পত্তির তো এখনো ভাগ-বাঁটোয়ারা হয় নি।

বৈদ্য। ভাগ-বাঁটোয়ারার কি আছে? কার সঙ্গে ভাগ হবে?

মহা। তোমার সঙ্গে।

বৈদ্য। এসব যদি পৈতৃক সম্পত্তি হ'ত, তা'হলে অবশ্য আমার ভাগ থাকত। এসব তো দাদার স্বোপার্জিত সম্পত্তি, সুতরাং এ সম্পত্তিতে আমার অধিকার কি?

মহামায়া একটু হাসিলেন। তারপর গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "মেয়েমানুষ হলেও আমি একেবারে মূর্খ নই ঠাকুরপো! দুই ভায়ে একান্নে থেকে যে সম্পত্তি হয়েছে, তাতে দুই ভায়েরই সমান অধিকার।

বৈদ্যনাথ বলিলেন, "অধিকার থাকলেও আমি ভাগ ছেড়ে দিচ্ছি।

মহামায়া বলিলেন, "তুমি ছেড়ে দিলেও আমি পরের সম্পত্তি নিতে বা বেচতে যাব কেন?"

বৈদ্যনাথ কিছুক্ষণ নিরুত্তরে থাকিয়া ঈষৎ অভিমানক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিলেন, "আমার সম্পত্তি তোমার কাছে পরের সম্পত্তি হ'ল? আমি কি তা'হলে এতই পর বৌঠান?"

ঈষৎ হাসিয়া মহামায়া উত্তর করিলেন, "পর বৈ কি! কথাতেই আছে, 'ভিন্ন ভাতে বাপ পড়শী'।"

গম্ভীরভাবে বৈদ্যনাথ বলিলেন, "ভিন্ন ভাত তো তুমিই করেছ!"

মহামায়া বলিলেন, “সেটা ভাল করেছি, না মন্দ করেছি ঠাকুরপো ?”

বৈদ্যনাথ বলিলেন, ‘ভাল কি মন্দ, সে কথা তুমিই জান। কিন্তু আজ নাকি তোমার একাদশীর উপবাস ?”

সহাস্যে মহামায়া উত্তর করিলেন, ‘তোমারই বা কোন্ দ্বাদশীর পারণ ?”

ভ্রুকুটি সহকারে বৈদ্যনাথ বলিলেন, “আমার কথা ছেড়ে দাও, আমারও ভিন্ন ভাতে পারণ করবার সাধ থাকে নি।”

মহামায়া বলিলেন, “তোমার সাধ থাকে নি তাই উপোস দিয়ে রয়েছ। কিন্তু যার সাধ ছিল, দেখ গিয়ে সে তোমার আগেই পারণ করে বসে আছে।”

এই বলিয়া মহামায়া হাসিয়া উঠিলেন। বৈদ্যনাথ নিরুত্তরে গম্ভীরমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন; খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তা'হলে এখন কি করবে বৌঠান ?”

মহামায়া বলিলেন, “সম্পত্তিতে আমার দরকার নেই। আমাকে কিছু টাকা দাও, তাই নিয়ে আমি কাশীতে গিয়ে থাকি।”

বৈদ্যনাথ বলিলেন, “কিন্তু ভোলা কি তোমার সঙ্গে যাবে ?”

ক্রুদ্ধস্বরে মহামায়া উত্তর করিলেন, “ভোলা আমার সঙ্গে যাবে কেন বল তো ? ভোলা আমার কে ? ভোলার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি ? ভোলার বাবা প্রাণ দিয়ে যাদের মান-ইজ্জৎ রক্ষা করেছে, তারাই ভোলার কথা বুঝবে।”

ঈষৎ হাসিয়া বৈদ্যনাথ বলিলেন, “উত্তম। তা'হলে কবে যাচ্ছ ?”

মহা। তুমি টাকা দিলেই যাব।

বৈদ্য। টাকা তো আমার হাতে নেই, যোগাড় করে দিতে দশ-পনেরো দিন দেরী হতে পারে।

মহা। দশ-পনেরো দিন পরেই যাব তা'হলে।

একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া বৈদ্যনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, “যে কয়

দিন এখানে থাকবে সে কয় দিন কি একাদশীতেই কাটবে?"

গম্ভীরভাবে মহামায়া বলিলেন, "ভগবান যে রকমে কাটাবেন, সেই রকমেই কাটবে। সেজন্য তোমার এত ভাবনা কেন ঠাকুরপো?"

সহাস্যে বৈদ্যনাথ বলিলেন, "ভাবনা আমার নেই বৌঠান, তবে তুমি আমাকে উপদেশ দিয়েছিলে, 'চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়া ঠিক নয়'—সেই জন্যেই কথাটা জিজ্ঞাসা করছি।"

দুঃখ-গম্ভীর স্বরে মহামায়া বলিলেন, "রাগ করব আমি কার উপর ঠাকুরপো? আমার রাগ এখন সইবে কে? এখন রাগ করলে আমি নিজেই ঠকে যাব।"

বৈদ্যনাথ বলিলেন, "ঠকে যাব নয়, ঠকে গিয়েছ; আর এখন উপোস দিয়ে সেই ভুল রাগের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইছ।"

মহামায়া সে কথার কোন উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার খাওয়া হয়েছে?"

বৈদ্যনাথ বলিলেন, "আমার খাওয়া হবে না কেন? অফিসে দিব্বি চা-বিস্কুট খেয়ে পেট ভরিয়েছি।"

"কিন্তু এ বেলা কি দিয়ে পেট ভরাবে?"

"বিধাতা যা মাপাবেন।"

"বিধাতা তো রান্নাঘরে বসে মাপাবার যোগাড় করেছেন।"

"না, আমার বিধাতা নিশ্চিন্ত হয়ে মালা ঘুরিয়ে পরকালের কাজ করছেন।"

ঈষৎ হাসিয়া মহামায়া বলিলেন, "ঐ পুরোনো বিধাতা ছুটি পেয়েছে ঠাকুরপো, এখন নূতন বিধাতার হাতে হাঁড়ি।"

বৈদ্যনাথ বলিলেন, "সেই জন্যেই তো আফিসে চা-বিস্কুটের ব্যবস্থা করতে হয়েছে।"

মহামায়া আর কিছু বলিলেন না; নীরবে বসিয়া মালা ঘুরাইতে লাগিলেন। বৈদ্যনাথ ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

এদিকে রন্ধন শেষ হইলে আমোদিনী চাকরকে দিয়া বৈদ্যনাথকে ডাকিতে পাঠাইলেন। বৈদ্যনাথ কিন্তু আসিলেন না। চাকর ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, বাবু কিছু খাবেন না।" শুনিয়া আমোদিনী রাগিয়া গেলেন; ভাবিলেন, বেশ তো মানুষ! দুই বেলা রান্না ভাত পড়িয়া রহিল, আর লোকটা না খাইয়া উপবাস দিয়া থাকিবে? কেন, হইয়াছে কি? আলাদা কি কেউ হয় না? ভায়ে ভায়ে আলাদা হয়, আর উনি ভাজের সঙ্গে আলাদা হইয়া সেই দুঃখে খাওয়া-দাওয়া ত্যাগ করিবেন! এতই যদি দুঃখ, তবে আলাদা হওয়া কেন? আমি কি আলাদা হইবার জন্য কাহারও পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়াছিলাম? এটা যেন শুধু আমাকেই আলাদা করিয়া দেওয়া, আমাকেই জব্দ করা!

আমোদিনী বড় দুঃখে প্রকাশ্যে এইরূপ বকিতে বকিতে বীর রস হইতে ক্রমে যখন করুণ রসের অবতারণা করিয়া ক্রন্দনের উপক্রম করিলেন, তখন মহামায়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে ছোটবৌ?"

আমোদিনী সখেদে বলিলেন, "হয়েছে আমার শ্রাদ্ধ! আহা, তোমরা দু'জনে আলাদা হবে, মাঝ থেকে আমার এ যন্ত্রণা-ভোগ কেন?"

মহামায়া বলিলেন, "তোর আবার যন্ত্রণা-ভোগটা কিসে হ'ল!"

আমোদিনী উত্তর করিলেন, "আমার যন্ত্রণা-ভোগ নয়! দু'বেলা রেঁধেবেড়ে তৈরী করলুম, কিন্তু খাবার সময় কারো দেখা নেই!"

মহামায়া বলিলেন, "তুই তাড়াতাড়ি তৈরী করতে গেলি কেন?"

অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে আমোদিনী বলিলেন, "ঝকমারি করেছি গো, ঝকমারি করেছি! এ রকম ঝকমারির কাজ আর যদি কখন করি তবে আমি কায়েতের মেয়েই নই। এখন তোমাকে জোড়হাত করে বলছি, মানুষটা সারাদিন খায় নি, যাতে খায় তার ব্যবস্থা কর।"

হাসিতে হাসিতে মহামায়া বলিলেন, "ব্যবস্থা করতে গেলে আবার তোর কাছে গাল খেতে হবে তো?"

আমোদিনী ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পায়ের কাছে মাথা কুটিতে কুটিতে বলিলেন, "না গো না, গাল খেতে হবে না। খুব শিক্ষা হয়েছে আমার। এখন উঠবে কিনা বল, নইলে আমি এখানে মাথা কুটে মরব।"

মহামায়া তাঁহার হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন, "থাম্ আবাগী, আর তোকে মাথা কুটে মরতে হবে না।'

আমোদিনীকে শান্ত করিয়া মহামায়া উঠিলেন এবং ভোলার দ্বারা বৈদ্যনাথকে বাড়ীর ভিতর ডাকিয়া পাঠাইলেন। বৈদ্যনাথ তথায় উপস্থিত হইলে মহামায়া তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তোমার রকমখানা কি ঠাকুরপো? এরকম না খেয়ে ক'দিন থাকবে?

ঈষৎ হাসিয়য়া বৈদ্যনাথ উত্তর দিলেন, "যে ক'দিন থাকতে পারা যায়!"

রাগে গর্জন করিয়া মহামায়া বলিলেন, "কেন, হয়েছে কি এমন, যে না খেয়ে থাকতে হবে?"

ধীরে ধীরে মাথাটা নাড়িয়া বৈদ্যনাথ বলিলেন, "না, হয় নি কিছু। তবে যা হয়েছে তাতে না খেয়ে থাকা কি, গলায় দড়ি না দিয়ে এখনো যে লোকের কাছে মুখ দেখান যাচ্ছে এই আশ্চর্য!"

বৈদ্যনাথের স্বরটা যেন একটু তীব্র হইয়া আসিল। মহামায়া স্বরটা একটু নরম করিয়া বলিলেন, "কেন বল তো গলায় দড়ি দিতে যাবে? ভাই ভাই কি কেউ আলাদা হয় নি?"

মুখ উঁচু করিয়া তীব্র অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে বৈদ্যনাথ উত্তর করিলেন, "ভাই ভাই আলাদা হয়, কিন্তু ভায়ের স্ত্রী মেয়েমানুষ—তাঁকে আলাদা করে দেওয়া, সে যে কি লজ্জার কথা, তা যদি জানতে বৌঠান, তা'হলে কক্ষনো এমন কথা বলতে না।"

মহামায়া একটু হাসিলেন। বলিলেন, "এতই লজ্জা যদি, তবে আলাদা হলে কেন ঠাকুরপো?

বৈদ্যনাথের চোখ দুইটা যেন জ্বলিয়া উঠিল ; ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় গর্জন করিয়া বলিলেন, "কেন আলাদা হলাম ? দাদা মারা গিয়েছেন, তখন থেকে আমি জানি তুমি শুধু আমার বৌদি নও, আমার দাদাও। মেয়েমানুষ হলেও তোমার হুকুমে আমি মাথা নীচু করে গুরু-আজ্ঞার মত পালন করে আসছি। কিন্তু তুচ্ছ রাগের বশে তুমি আমাকে আলাদা করে দিতে বললে। বেশ আলাদা করে দিয়েছি এখন তোমার যা খুসী করতে পার। বদ্যিনাথ মল্লিক কিন্তু তোমাকে আলাদা করে রেখে এ ভিটে জল গ্রহণ করবে না।"

ক্রোধে ক্ষোভে বদ্যিনাথ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া যেন ফুলিতে লাগিলেন।

মহামায়া ধীরে ধীরে তাঁহার একখানা হাত ধরিলেন। আর্দ্র কণ্ঠে ডাকিলেন, "ঠাকুরপো !"

জোরে নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বৈদ্যনাথ বলিলেন, "কি বল !"

স্নেহসজল-কণ্ঠে মহামায়া বলিলেন, "হাঁড়ি আলাদা করে দিলেও মনটাকে তুমি আলাদা করে দিতে পারনি ঠাকুরপো ! এখন খাবে চল।"

রন্ধনশালার দিকে কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বৈদ্যনাথ বলিলেন, "কি খাব, ঐ আলাদা হাঁড়ির ভাত ?"

মহামায়া বলিলেন, "হ'লই বা আলাদা হাঁড়ি। ছোটবৌ রেঁধেছে, আমি ভাত বেড়ে দিচ্ছি। মেয়েমানুষ, যদিই একটা অন্যায় করে থাকে—"

মহামায়ার নেত্রপ্রান্ত দিয়া কয়েক বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

জোরে মাথা নাড়িয়া বৈদ্যনাথ বলিলেন, "শুধু কেঁদে জিতলে হবে না, বল—এ রকম অন্যায় আর কক্ষনো করবে না।"

বাঁ হাতে চোখের জল মুছিয়া মহামায়া বলিলেন, "মানুষ কতবার ভুল করে ঠাকুরপো ? তুমি যে শিক্ষা দিয়েছ, জীবনে তা ভুলবার নয়, ছোটবৌও হয় তো ভুলবে না।"

বৈদ্যনাথকে টানিয়া লইয়া মহামায়া রন্ধনশালায় প্রবিষ্ট হইলেন। অমোদিনী দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অপরাধীর মত মুহ্যমান ভাবে একপাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

॥ বিশ ॥

সকালে নন্দরাণী খিড়কীপুকুরের ঘাটে বসিয়া বাসন মাজিতেছিল। ঘাটের উপর একটা বড় জামগাছ। গাছে বিস্তর জাম ফলিয়াছিল, কিন্তু তখনও পাকে নাই। নন্দরাণী বাসন মাজিতে মাজিতে এক-একবার মুখ তুলিয়া দেখিতেছিল আর ভাবিতেছিল জামগুলি পাকিতে কত দেরী!

এমন সময় বন-জঙ্গল ভাঙ্গিয়া একটা লোক ঘাটের সন্নিকটে উপস্থিত হইল। তাহাকে এরূপভাবে আসিতে দেখিয়া নন্দরাণী ভয়ে চীৎকার করিবার উপক্রম। কিন্তু চীৎকার করিবার পূর্বেই লোকটা যখন সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন নন্দরাণীর ভীতি দূর হইল। সে আশ্চর্যভাবে একটু হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি?"

যে আসিয়াছিল, সে ভোলা। ভোলা ইতস্তত: শতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উত্তর দিল, "হ্যাঁ আমি। পট্‌লা ছোঁড়াকে লুকিয়ে আসতে হয়েছে। দেখতে পেলে ছোঁড়া টিট্‌কারী দেয়।"

নন্দরাণী বলিল, "তা সকালবেলা বন-জঙ্গল ভেঙ্গে আসবার কি দরকার ছিল?"

যেন খুব ব্যস্ততার সহিত ভোলা বলিল, "একটা দরকারী কথা জানতে এসেছি নন্দরাণী, সত্যি বলবে?"

নন্দরাণী বলিল, "মিছে বলা আমার অভ্যাস নেই।"

ভোলা ঘাটের এক ধাপ নীচে নামিয়া আর একবার এদিকে-ওদিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা কাল তুমি ইচ্ছা করে জলে ডুবেছিলে, না দৈবাৎ জলে পড়ে গিয়েছিলে?"

নন্দরাণী বলিল, "কলসীটা ধরতে গিয়ে ডুবে গিয়েছিলাম।"

ভোলা বলিল, "তা'হলে সত্যিই তুমি জলে ডুবে মরতে যাও নি?

তাহার মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নন্দরাণী উত্তর করিল, "শুধু শুধু জলে ডুবে মরতে যাব কেন?"

ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "তা'হলে পটলার জ্যেঠা তো ভারী মিথ্যুক! সে কিনা সকলের সাম্‌নে বলল, বুড়ো বরের সঙ্গে বিয়ে হবে বলে তুমি জলে ডুবে মরতে গিয়েছিলে! পটলা, কেলো, মানুকে এই কথা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিল। তাই কাল আমার সঙ্গে খুব এক চোট্ ঝগড়া হয়ে গিয়েছে।"

নন্দরাণী তাহার দিক্ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া ত্রস্তহস্তে থালা মাজিতে প্রবৃত্ত হইল।

ভোলা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা যার সঙ্গে তোমার বিয়ে ঠিক হয়েছে, সে কি খুব বুড়ো?"

নন্দরাণী একটু হাসিয়া বলিল, "যদি খুব বুড়োই হয়!"

ঘাড় দোলাইয়া ভোলা বলিল, "তা'হলে তার বিয়ে করা খুবই অন্যায় হচ্ছে। আমার ইচ্ছা হয়, আমি একদিন গিয়ে এই অন্যায়টা তাকে বুঝিয়ে দিয়ে আসি।"

চাপা হাসির সঙ্গে নন্দরাণী বলিল, "যদি না বুঝে?"

উত্তেজিত স্বরে ভোলা বলিল, "না বুঝলে স্কুলের ছেলেদের নিয়ে তার নামে গান বেঁধে চারিদিকে গেয়ে বেড়াব।"

নন্দরাণীর বাসন মাজা শেষ হইয়া আসিয়াছিল। সে বাসনগুলি একে একে জলে ধুইয়া পৈঠার উপর গুছাইতে লাগিল।

ভোলা বলিল, "কাল রবিবার আছে, পারি তো কাল মানুকেকে সঙ্গে নিয়ে একবার যাব। সীতাপুর তো দু'পার রাস্তা!"

নন্দরাণী বাসনগুলি গুছাইয়া লইয়া ভোলার দিকে ফিরিয়া বলিল, "আমার একটা কথা শুনবে?"

"কি কথা বল।"

"ওখানে গিয়ে কাজ নেই।"

ভোলা বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে নন্দরাণীর মুখের দিকে চাহিল।

নন্দরাণী বলিল, "যাবে না বল?"

ভোলা উদাসভাবে বলিল, "আমি তোমার ভালর জন্যেই—"

তীব্র তিরস্কারের স্বরে নন্দরাণী বলিল, "আমার ভাল করবার জন্যে আমি কারো পায়ে ধরতে যাচ্ছি না। অপরের চেয়ে আমার ভাল আমি নিজে বেশী বুঝি।"

বাসনগুলি লইয়া নন্দরাণী গভীর পদবিক্ষেপে বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। ভোলা ক্ষুন্নচিত্তে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে প্রস্থান করিল।

বাসনের শব্দ পাইয়া কৈলাসনাথ ঘরের ভিতর হইতে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে, নন্দ?"

নন্দরাণী উত্তর দিন, "হঁা আমি। কেন বাবা?"

কৈলাসনাথ আস্তে আস্তে বলিলেন, "অপর কিছু নয়, দেরী হচ্ছে দেখে ভাবছিলাম, বেলা কতটা হয়েছে মা?"

বাহিরে রোদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নন্দরাণী উত্তর দিল, আটটা-সাড়ে আটটা হবে মনে হয়। তুমি বাইরে আসবে বাবা?"

কৈলাসনাথ বলিলেন, "যাব বৈ কি। কাল সন্ধ্যা থেকে এতখানি বেলা হ'ল, ঘরের ভিতরেই রয়েছি। প্রাণ যেন ছট্‌ফট্ করছে।"

নন্দরাণী তাড়াতাড়ি দাবার উপর মাদুর পাতিয়া পিতাকে হাত ধরিয়া বাহিরে আনিয়া বসাইল। বাহিরে আসিয়া কৈলাসনাথ একটা আরামের দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। নন্দরাণী জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কেমন আছ বাবা? জ্বর আছে কি?"

উপেক্ষার স্বরে কৈলাসনাথ বলিলেন, "বোধ হয় একটু আছে।"

নন্দরাণী বলিল, "তা'হলে বিন্দীকে একবার ডাকব বাবা? একবার ডাক্তারের কাছে যেত।"

"ডাক্তারের কাছে যেতে হবে না, এ জ্বর এমনি সেরে যাবে।"

কিন্তু নন্দ ! ঘটক ঠাকুরের কাল সন্ধ্যা নাগাদ এসে খবর দেবার কথা ছিল, কিন্তু কৈ এল না তো !

নন্দরাণী বলিল, বোধ হয় কাজের গতিকে আসতে পারে নি !"

কৈলাসনাথ বলিলেন, "আসতে পারে নি কি রকম ! পরশু বিয়ের দিন ঠিক করে গিয়েছে, কাল এসে খবর দেবার কথা, কিন্তু আজ এতখানি বেলা পর্যন্ত দেখা নেই। কিছু গোল বাধল নাকি ?"

নন্দরাণী এ কথার কি উত্তর দেবে ? সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কৈলাসনাথ তাহার দিকে চাহিয়া ধীর মস্তক সঞ্চালন সহকারে বলিলেন, "যদিই কিছু গোলমাল বাধে, যদিই সম্বন্ধটা ভেঙ্গে যায়, তা'হলে—তা'হলে এক রকম ভালই হয় না নন্দ ?"

নন্দরাণী নতমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল আর কি হয় বাবা ?"

ব্যস্ততার সহিত কৈলাসনাথ উত্তেজিতকণ্ঠে বলিলেন, "খুব ভাল হয়। একি তোর উপযুক্ত বর নন্দ ? বুড়ো—তার উপর সতীন,—ওঃ ! না বুঝে আমি কি ভয়ানক কাজ করতে যাচ্ছিলাম নন্দ !"

কৈলাসনাথের চোখ দুইটা দপ্‌দপ্‌ করিয়া জ্বলিতে লাগিল, কপালের শিরাগুলি অস্বাভাবিকরূপেই স্ফীত হইয়া উঠিল; তিনি অবসন্ন দেহে শুইয়া পড়িলেন।

নন্দরাণী তাড়াতাড়ি একটা বালিশ আনিয়া তাঁহার মাথার নীচে দিল এবং জোরে জোরে মাথায় পাখার বাতাস দিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে কৈলাসনাথ প্রকৃতিস্থ হইলেন; ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া ডাকিলেন, "নন্দ !"

নন্দরাণীর আশঙ্কামলিন মুখখানা অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। ব্যগ্রস্বরে অথচ খুব আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন একটু ভাল বোধ করছ কি বাবা ?"

কৈলাসনাথ বলিলেন, "অনেকটা ভাল। ভয় নেই নন্দ, হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল। নইলে অন্য অসুখ কিছুই নয়।"

নন্দরাণী বলিল, "দিনরাত ভাবনা, তার ওপর কাল থেকে কিছু খাওয়া নেই। আজ কি খাবে বাবা?"

কৈলাসনাথ বলিলেন, "কি আর খাব? জ্বরের উপর ভাতটা খাওয়া ঠিক নয়। একটু সাবু খেয়েই থাকব।"

নন্দরাণী বলিল, "সাবু তো তুমি কতই খাও! কাল এক বাটি সাবু তৈরী করে দিলাম, এক চুমুক খেয়েই তো রেখে দিলে! আজ না হয় আধ সের দুধ নিয়ে আসি।"

"দুধ কোথায় পাবে?"

"পয়সা দিলে দুধের অভাব কি?"

"আধ সের দুধের দাম ছ'টা পয়সা। কাল তরকারীর অভাবে তোর খাওয়াই হয় নি নন্দ।"

ভারীমুখে পিতাকে ধমক দিয়া নন্দ বলিল, "হাঁ, খাওয়া হয় নি, আমি উপোবাস দিয়ে রয়েছি বুঝি! তুমি বরং নিজে কিছু খেতে চাও না—তা ভাল অবস্থাতেই বা কি, অসুখ-বিসুখ হলেই বা কি।"

কৈলাসনাথ বলিলেন, "তোর বাবাকে আধ সের দুধ খাওয়ালেই যদি তোর তৃপ্তি হয়, তবে তাই খাইয়ে দে নন্দ, আমি তোর তৃপ্তিতে আর বাধা দিতে চাই না।"

বিন্দীর দ্বারায় দুধ আনাইয়া নন্দরাণী তাড়াতাড়ি দুধ জ্বাল দিয়া পিতাকে খাইতে দিল। কৈলাসনাথ উঠিয়া দুধের বাটি মুখের কাছে ধরিয়াছেন, এমন সময় জনৈক স্ত্রীলোক একখানা পত্র লইয়া উপস্থিত হইল। কৈলাসনাথ দুধের বাটি নামাইয়া রাখিয়া তাড়াতাড়ি পত্রখানা খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। পত্রে লেখা ছিল—

"মহাশয়, আমি কে তাহা বোধ হয় জানেন না। আপনি যাহার সহিত আপনার কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ করিয়াছেন, আমি তাঁর স্ত্রী। আপনি নাকি খুব পয়সা দেখিয়া আমার বুড়ো স্বামীর হাতে আপনার কন্যাকে দান করিতে উদ্যত হইয়াছেন! আমার স্বামী বিবাহের জন্য পাগল হইয়াছেন জানি, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে আপনি কি পাগল

হইয়াছেন? নতুবা এমন করিতে যাইবেন কেন? কন্যার উপর আপনার কি একটুও মমতা নেই? আপনারা খুব গোপনে গোপনেই কাজ শেষ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়িয়াছে,—আপনাদেরই গ্রামের এক বুড়ো বামুন আসিয়া সকল কথা প্রকাশ করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

আপনি যদি পয়সার অভাবে এমন কাজ করিতে উদ্যত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে পত্রপাঠ মাত্র আপনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন। আপনার কন্যার বিবাহে যত টাকা দরকার, তাহা আমি আপনাকে দিব! নগত টাকা আমার হাতে না থাকিলেও আমার যে গহনাপত্র আছে, তাহা বেচিলে সাত-আট শত টাকা হইবে। আমি শুধু হাতের লোহা ছ'গাছা রাখিয়া বাকী সব গহনা বেচিয়া আপনাকে টাকা দিব। কিন্তু দোহাই আপনায়, আমার ও আপনার কুমারী কন্যার সর্বনাশ করিবেন না। করিলে আপনাকে স্ত্রীহত্যা-পাপের ভাগী হইতে হইবে।

আপনাকে সাবধান করিয়া দিতেছি, আমার নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া আমার স্বামীর সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ দিলে আপনার কন্যা এক দিনের জন্যও স্বামীর ঘর করিতে পারিবে না। আমি বিষ খাওয়াইয়া পারি, গলা টিপিয়া পারি আমার শত্রুকে ইহলোক হইতে বিদায় করিয়া দিব। তারপর ফাঁসি যাইতে হয় যাইব, তথাপি সতীনকাঁটার ঘা সহ্য করিতে পারিব না, ইহা নিশ্চয়—নিশ্চয় জানিবেন!

ইচ্ছা করিলে আপনি এই পত্র আমার স্বামীকে দেখাইতে পারেন। সে জন্য আমি ভীত নই। ইতি—

নিবেদিকা—শ্রীমতী কাদম্বিনী দাসী।

পত্রের লেখাটা অন্য পাকা হাতের, কিন্তু সহিটা মোটা মোটা আঁকাবাঁকা অক্ষরের স্ত্রীলোকের হাতের। কৈলাসনাথ চিঠিখানা আদ্যোপান্ত পড়িলেন।, পড়িতে পড়িতে তাঁহার মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ

ধারণ করিল। হাতের সঙ্গে পত্রখানা থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। পত্রপাঠ শেষ করিয়া তিনি উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে পত্রবাহিকার দিকে চাহিলেন, কিন্তু পত্র দিয়াই সে চলিয়া গিয়াছিল। কৈলাসনাথ ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে পত্রখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া অবসন্নভাবে পুনরায় শুইয়া পড়িলেন।

নন্দ কাছে আসিয়া বলিল, "দুধটা তো ঠাণ্ডা হয়ে গেল বাবা।"

কন্যার মুখের উপর তীব্র ভ্রূকুটীপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কৈলাসনাথ চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

পিতার অবস্থা দেখিয়া নন্দরাণী ভীত হইল। বিন্দীও ভয় পাইয়া ডাক্তার ডাকিয়া আনিল, এবং তাহার নিজের টাকা দিয়া ঔষধ আনিয়া দিল। ঔষধে কিন্তু ফল হইল না; রাত্রে আবার প্রবল জ্বর দেখা দিল। জ্বরের ঘোরে কৈলাসনাথ প্রলাপ বকিতে লাগিলেন, নন্দরাণী ও বিন্দী রাত্রি জাগিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

এক দিনের মধ্যেই গ্রামে প্রচার হইয়া গেল যে, কৈলাস মিত্রের অবস্থা আসন্ন, বুড়ো আর বাঁচিবে না। শুনিয়া দলে দলে লোক বুড়োকে দেখিতে ছুটিল।

যাহারা কৈলাস মিত্রের দুরবস্থার জন্য কখনও কিছুমাত্র দুঃখিত হয় নাই, তাহারাও দেখিতে গিয়া কৈলাস মিত্রের জন্য দুঃখ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিল না। হালদার মহাশয় প্রমুখ সমাজপতিগণ মল্লিকদের বৈঠকখানায় সমবেত হইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন, বুড়া মরিলে তাহার সদগতির কি ব্যবস্থা হইবে।

মহামায়াও কৈলাস মিত্রের অবস্থার কথা শুনিলেন। শুনিয়া তিনি বৈদ্যনাথকে বলিলেন, "কৈলাস মিত্তির নাকি মরমর হয়েছে। তাকে একবার দেখতে গেলে না ঠাকুরপো?"

বৈদ্যনাথ বলিলেম, "যার সঙ্গে এত কাল শত্রুতা করে এসেছি, তাকে এ সময়ে কোন্ মুখে দেখতে যাব বৌঠান?"

মহামায়া বলিলেন, "লোকটা সংসার থেকে চিরবিদায় নিচ্ছে,

এই জন্যেই তার সঙ্গে দেখা করে অন্ততঃ তার মন থেকে বিদ্বেষের আগুনটুকুও নিবিয়ে দেবার চেষ্টা করলে আমাদের মঙ্গলই হবে।"

মৃত্যুপথযাত্রী কৈলাস মিত্রের সহিত দেখা করিবার আগ্রহ যে বৈদ্যনাথের ছিল না, তাহা নহে। শত্রু হইলেও কৈলাস মিত্রের শোচনীয় অবস্থা স্মরণে বৈদ্যনাথের প্রাণটা যেন কি এক অজ্ঞাত আঘাতে একটু কাতর হইয়া উঠিতেছিল। এসময় একবার দেখা করিয়া তাহার কোন উপকার করা যায় কিনা এমন একটা প্রবৃত্তিও বৈদ্যনাথের মনোমধ্যে উদিত হইতেছিল। কিন্তু যে মরিতে বসিয়াছে শত্রুর নিকট হইতে সে আজ কোন্ উপকার গ্রহণ করিবে! এখন দেখা করিতে যাওয়া একটা তীব্র পরিহাস হইবে মাত্র।

কিন্তু মহামায়া যখন বুঝাইয়া দিলেন যে, এসময়ে কৈলাস মিত্রকে দেখা কর্ত্তব্য, তখন বৈদ্যনাথ চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। সন্ধ্যার পর মৃত্যুপথযাত্রীর সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন।

কৈলাসনাথের অবস্থা তখন সঙ্কটাপন্ন। জ্বর এত বেশী হইয়াছিল যে, তাহাতে ডাক্তার পর্যন্ত শঙ্কিত হইয়াছিলেন, এবং এই জ্বরবিচ্ছেদের কালে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। জ্বরের প্রকোপে তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন; বাক্‌শক্তিও যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। সময়ে সময়ে এক-একটু জ্ঞানের সঞ্চার হইতেছিল, কিন্তু তাহা ক্ষণিক মাত্র। সন্ধ্যার সময় ডাক্তার আসিয়া বলিয়া গিয়াছেন রাত্রে জ্বরবিচ্ছেদের সময় কি হয়, বলা যায় না। সে সময়টা কোনরূপে কাটিয়া গেলে আর ভয় নাই। নন্দরাণী মাথার কাছে বসিয়া ব্যাকুলনেত্রে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। অদূরে বসিয়া বিন্দী বাতাস দিতেছিল। প্রদীপের মিট্‌মিটে আলোটা বাতাসে কাঁপিয়া কাঁপিয়া স্তব্ধ গৃহমধ্যে ছায়ান্ধকারের সৃষ্টি করিতেছিল।

এমন সময় বৈদ্যনাথ অতি সন্তর্পণে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া নন্দরাণী সবিস্ময়ে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল।

বৈদ্যনাথ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কেমন আছেন?"

এমন সময় বৈদ্যনাথ অতি সন্তর্পণে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া নন্দরাণী সবিস্ময়ে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল।

বৈদ্যনাথ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কেমন আছেন?"

নতমস্তকে মৃদুস্বরে নন্দরাণী উত্তর দিল, "সেই একই রকম।"

"ডাক্তার কি বলেন?"

"বলেন, রাতটা যদি কাটে—"

নন্দরাণীর স্বরটা জড়াইয়া আসিল, বৈদ্যনাথ তাহাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া ধীরে ধীরে গিয়া রোগীর শিয়রে বসিলেন, এবং লজ্জাজড়িত কণ্ঠে ডাকিলেন, "মিত্তির মশাই, মিত্তির মশাই!"

দুই-তিন ডাকের পর কৈলাসনাথ চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। অনেকক্ষণ বৈদ্যনাথের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে—হালদার মশায়?"

"না, আমি বৈদ্যনাথ মল্লিক।"

বিস্ময়ে ও আনন্দে কৈলাসনাথের পাণ্ডুর মুখখানা সহসা যেন অস্বাভাবিকরূপে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; বিস্ময়জড়িত ক্ষীণকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "বদ্যিনাথবাবু!"

কৈলাসনাথ চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। বৈদ্যনাথ নীরবে তাঁহার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে কৈলাসনাথ পুনরায় চক্ষু উন্মীলিত করিলেন; ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে দেখতে এসেছেন বদ্যিবাবু?"

কম্পিতকণ্ঠে বৈদ্যনাথ বলিলেন, "শুধু দেখতে আসি নি মিত্তির মশাই, যে গণ্ডী এতদিন আমাদের পৃথক করে রেখেছিল, আমি সেই গণ্ডীটুকু ভেঙ্গে দিতে এসেছি।"

কৈলাসনাথ আপনার শীর্ণ হাতখানি তুলিয়া ধীরে ধীরে বৈদ্যনাথের ক্রোড়ের উপর রাখিলেন, এবং একটা খুব আরামের নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "এতটা শান্তি নিয়ে যে মরতে

পারব এটা একদিনও আমি ভাবতে পারি নি বৈদ্যনাথবাবু! আপনার দয়া অপরিসীম!"

কৈলাসনাথের কোটরাগত নিষ্প্রভ নয়নপ্রান্তে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। বৈদ্যনাথের চোক্ষেও অশ্রু বহিল; বাষ্পজড়িতস্বরে বলিলেন, "আপনার দয়াও বড় কম নয় মিত্তির মশাই! এমন ভয়ানক দুঃখপূর্ণ অতীতটাকে ভুলে গিয়ে আপনি যে এত সহজে মিলনটা স্বীকার করে নেবেন, আমি তা ভাবতে পারিনি। আপনি মহৎ!"

কৈলাসনাথ বলিলেন, "আপনার মহত্ত্ব আরো বেশী। আপনি রাজীব মল্লিকের উপযুক্ত পুত্র!"

বৈদ্যনাথ বলিলেন, "কিন্তু আপনার কাছে আমি আর একটু দয়ার প্রত্যাশা করি।"

বিস্ময় সহকারে কৈলাসনাথ বলিলেন, "এ মিলনের পরে আপনি আর কি চান বৈদ্যনাথবাবু?"

বৈদ্যনাথ বলিলেন, "আমরা চিরকাল আপনার অনিষ্টই করে এসেছি, কিন্তু এখন যদি সামান্য একটু উপকার করিতে পারি—"

কৈলাসনাথ নীরবে নিমীলিত নেত্রে অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিলেন; তারপরে সহসা চক্ষু উন্মীলিত করিয়া বলিলেন, "সত্যি আমার উপকার করবেন বৈদ্যনাথবাবু?"

বৈদ্যনাথ বলিলেন, "আপনি যদি সে উপকার গ্রহণ করেন তা'হলে বুঝব আমাদের এ মিলন সার্থক।"

কৈলাসনাথের নিষ্প্রভ নেত্রদ্বয় প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল; ডাকিলেন—"নন্দরাণী!"

নন্দরাণী ধীরে ধীরে আসিয়া পিতার পাশে বসিল। কৈলাসনাথ আস্তে আস্তে তাহার হাতখানি ধরিয়া অশ্রুগদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "তা'হলে বৈদ্যনাথবাবু, আমার এই অনাথা মেয়ে—"

কৈলাসনাথ বক্তব্য শেষ করিতে পারিলেন না, তাঁহার উভয় গণ্ড

প্লাবিত করিয়া অশ্রুপ্রবাহ প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

বৈদ্যনাথ ডাকিলেন, "মিত্তির মশাই!"

আর সাড়া পাওয়া গেল না। অতিরিক্ত উত্তেজনায় কৈলাসনাথ পুনরায় অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। বৈদ্যনাথ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে বসিয়য়া রহিলেন।

রাত্রি প্রায় দশটার সময় জ্বরবিচ্ছেদ আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে কৈলাসনাথের অঙ্গপ্রতঙ্গ শীতল হইয়া আসিতে লাগিল। দেখিয়া বৈদ্যনাথ শঙ্কিত হইলেন, তক্ষুনি রোগীর নাড়ী টিপিয়া শঙ্কাকম্পিত কণ্ঠে ডাকিলেন, "মিত্তির মশাই!"

নন্দরাণী চিৎকার করিয়া ডাকিল "বাবা, বাবা!"

কৈলাসনাথ যেন বহুকষ্টে একবার চোখ মেলিয়া কি বলিতে গেলেন, কিন্তু কথা বাহির হইল না, ওষ্ঠ একবার মাত্র স্ফুরিত হইয়াই নিস্পন্দ হইল। আর্ত চীৎকারে নৈশ গগন প্রতিধ্বনিত করিয়া নন্দরাণী "বাবা গো!" বলিয়া পিতার প্রাণহীন দেহের উপরে লুটাইয়া পড়িল।

॥ একুশ ॥

মহামায়া সকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া সবেমাত্র ঘরের বাহিরে আসিয়াছেন; এমন সময় নন্দরাণীর হাত ধরিয়া বাড়ী ঢুকিয়াই বৈদ্যনাথ উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, "বৌঠান!"

ডাক শুনিয়া মহামায়া উত্তর দিলেন, "কেন ঠাকুরপো!"

তাঁহার সম্মুখে নন্দরাণীকে দাঁড় করাইয়া দিয়া বৈদ্যনাথ বলিলেন, কৈলাস মিত্তিরের সঙ্গে মিলনের সাক্ষী-স্বরূপ কি এনেছি দেখ!"

বিস্ময়ের সহিত মহামায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কে ঠাকুরপো?"

"এ নন্দরাণী।"

কৈলাস মিত্রের মেয়ে নন্দরাণী! মহামায়া বিস্ময়চকিত দৃষ্টিতে নন্দরাণীর অশ্রুকাতর মুখের দিকে চাহিলেন।

বৈদ্যনাথ বলিলেন, "একদিন তুমি ভোলার বিয়ে দিতে অমত করেছিলেন বৌঠান, কিন্তু এবার অমত করলে আর তা শুনব না। তোমার কথাতেই আমি মিত্তির মশায়ের সাথে মিলন করে এসেছি, এখন ভোলার সঙ্গে নন্দরাণীর মিলনসূত্র গেঁথে দিয়ে তুমি সে মিলনটাকে সার্থক—সম্পূর্ণ করে দাও। তা বল দেবে কি না?"

হাসিতে হাসিতে মহামায়া বলিলেন, "যদি তা না দিই?"

জোরে মাথা নাড়িয়া বৈদ্যনাথ বলিলেন, "তা'হলে—তা হলে আমি জোর করে নন্দরাণীর সঙ্গে ভোলার বিয়ে দেব, জোর করে তোমাকে আবার আলাদা করে দেব।"

মহামায়া বলিলেন, "তোমার সে জোর আছে তা জানি। কিন্তু একবার মিলনের সুর বেজে উঠলে আর বিচ্ছেদের সুর বাজতে পারে না ঠাকুরপো! কৈলাস মিত্রের সঙ্গে বিরোধের অবসান করে তুমি যে মিলনের সুর তুলে দিয়েছ, ভোলার বিয়েতে তুমি সে সুরটাকে সহজ করে দাও।"

"তবে আমি আগে হতেই শাঁক বাজিয়ে সুর তুলে দিই।" বলিয়া আমোদিনী ছুটিয়া ঘর হইতে শাঁক আনিয়া পোঁ করিয়া বাজাইয়া দিলেন। সেই শঙ্খধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলিয়া মিলনের আগমনবার্তা গ্রামময় ছড়াইয়া দিতে লাগিল।

॥ শেষ ॥